রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত লালনের গানের খাতা

লালন শাহ

১৭৭৪—১৮৯০

আবুল আহসান চৌধুরী

বাংলা একাডেমী ঢাকা

জীবনী গ্রন্থমালা

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৬ ॥ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

বা/এ ॥ ২৩৬০

পাণ্ডুলিপি : গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক : শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রচ্ছদ : সমর মজুমদার

মুদ্রণ : ওবায়দুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

মূল্য : পনেরো টাকা মাত্র ॥ দেড় মার্কিন ডলার

JIBANI GRANTHAMALA : A series of literary biographies

LALAN SHAH by Abul Ahsan Chowdhury. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition: Magh 1396 / February 1990. Price : Taka 15·00 only US dollar 1·50 only

Tribute to the Martyrs of the Language Movement 1952

প্রসঙ্গ-কথা

সামসময়িক চৈতন্যকে বিস্তৃততর, প্রাগ্রসর, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম-সঞ্চারী ও মানবিক করতে হলে, আমাদের ঐতিহ্য ও জাতি-সত্তামূলে সংযুক্ত হওয়া অনিবার্য ; কেননা সাহিত্যিক ও মননশীল সম্প্রদায়ই কোনো জাতির চেতনালোকের শীর্ষপ্রান্ত, এবং তাঁরাই ঐতিহ্যের শতমূল, শক্তি-উৎসের পাতালিক মৃত্তিকা। সুতরাং, শুধু বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ গবেষকদের প্রশ্নেই নয়, জাতি-সত্তা গঠনের উপাদান হিসেবেও, সাধারণ পাঠকের জন্য 'জীবনী-গ্রন্থমালা' শীর্ষক প্রকল্পের গুরুত্ব যেমন অপরিহার্য, তেমনি এর দ্রুততর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তাও অপরিসীম। এ-প্রসঙ্গে বাংলা একাডেমীর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আজ পরিণত হয়েছে সুপ্রমাণিত ও সক্রিয় এক আদর্শে, বিশ্বাসে। সত্তা-পরিচয়-সন্ধানী জাতিকে এ তথ্য জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত যে, গত তিন বছরে তিরানব্বই জন সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের জীবনী-গ্রন্থ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এবার একুশে ফেব্রুয়ারিতেও ভাষা-আন্দোলনের অমর শহীদদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের সশ্রদ্ধ নিবেদন আরো ছাত্রিশ জন সাহিত্যিকের জীবন-কথা।

মানববাদী, অসাম্প্রদায়িক ও মরমী কবি লালন শাহের প্রধান কীর্তি তাঁর কথা ও সুর। লোক ও লোকোত্তর, জীবন ও জীবনাতীত, পার্থিব ও অপার্থিব, শরীর ও শরীরাতীতের সমন্বিত অধ্যাত্ম ও অসীম ভাবনার অন্তর্ময় কবি লালন শাহ বাঙালি জাতির মন ও মননের চলমান ঐতিহ্য। মরমী সাধনতত্ত্ব নয়, তাঁর গানের অন্তর্ময় মানববেদনা ও মানবপ্রেম আজও বাঙালির হৃদয়কে স্পর্শ করে। রবীন্দ্র জীবন-অনুধ্যানে লালন-দর্শন সর্বাধিক মর্যাদা পেয়েছে। সম্প্রদায় ও সঙ্কীর্ণ জাত্যাভিমান-পীড়িত বর্তমান বিশ্বে লালন শাহের সর্বমানব-ঐক্যের গীতময় আহ্বান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষক ও প্রাবন্ধিক আবুল আহসান চৌধুরী কবি লালন শাহের জীবন-কাহিনী আন্তরিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

জীবনী-গ্রন্থমালা প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

মাহমুদ শাহ্‌ কোরেশী
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

সূচী

লালন শাহ (নন্দলাল বসু অংকিত)

জীবন-কথা

বাউলগান লোকায়ত বাঙালীর ভাব-মানসের জাতীয় সঙ্গীত। বাউল-সাধক লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) সেই ভাবজগতের গানের রাজা—বাঙলার বাউলের শিরোমণি। বাউলগানের বিপুল লোক-প্রিয়তার মূলে তাঁর অবদান সর্বাধিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আজ প্রায় দুই শতাব্দীকাল তাঁর গান বাঙালীর মরমী-মানসের অধ্যাত্ম-ক্ষুধা ও রস-তৃষা মিটিয়ে আসছে।

লালনের সঙ্গীত, সাধনা ও দর্শন লৌকিক জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে শিক্ষিত নাগরিক বিদ্বজ্জনকেও স্পর্শ ও প্রাণিত করেছে। এই কালোত্তীর্ণ অসাধারণ শিল্প-প্রতিভা তাঁর স্বকালেই লোকপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিলেন। তাঁর মুক্তবুদ্ধি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, সমাজমনস্কতা ও মানব মহিমাবোধ তাঁর বাউল-চরিত্রে একটি দুর্লভ ও অভিনব মাত্রা যুক্ত করেছিল। বৃহত্তর বাঙলার গ্রামীণ জীবনে তিনি একটি জাগরণ এনেছিলেন—জন-চিত্তে জাগিয়েছিলেন ব্যাপক সাড়া। গ্রামীণ বাঙলার এই প্রাণপুরুষের ভূমিকাকে অনেকক্ষেত্রে কেউ কেউ বাঙলার নাগরিকসমাজে নবজাগরণের ঋত্বিক রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছেন।

লালনের প্রধান পরিচয় তাঁর গানে—আর সেই গানই তাঁকে দুই শতাব্দী বাঁচিয়ে—জাগিয়ে রেখেছে। বাঙলার অপর কোনো মরমীসাধক বা লোককবি লালনের মতো বিপুল পরিচিতি, ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা ও অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হননি। তাঁর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠার পরিধি আজ দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্বের ভূগোলকে স্পর্শ করেছে। তাঁর প্রতি আন্তর্জাতিক-মনোযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বহির্বিশ্বে লালন বাঙলাদেশ ও বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রতিনিধি-ব্যক্তিত্ব হিসেবে গৃহীত হবেন সে সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কুষ্টিয়া তথা নদীয়া আউল-বাউল-ফকির-বৈষ্ণবের দেশ। এই অঞ্চল লোকসংস্কৃতি ও মরমীসাধনার একটি উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। বল-রামভজা, সাহেবধনী, কর্তাভজা, খুশিবিশ্বাসী প্রভৃতি সঙ্গীতাশ্রয়ী লৌকিক ধর্মমতের উদ্ভব ও বিকাশ বৃহত্তর নদীয়া জেলাকে কেন্দ্র করে হয়েছিল। বাউলমতের উৎপত্তিও এই অঞ্চলেই বলে পণ্ডিতদের অভিমত। মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২) বলেছেন:

> ...পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া, এবং ঐতিহাসিক সত্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, নদীয়া জেলাই বাউল-মতের উদ্ভবের স্থান; ঈশ্বরপুরী, চৈতন্যদেব, অদ্বৈতাচার্যের কথা বাদ দিয়াও, নদীয়ায় আরও কয়েকজন প্রাচীনতম বাউলের নাম জানিতে পারা যায়; তাঁহারা হরিগুরু, বনচারী, সোনাকমলিনী ও অখিলচাঁদ।...সুতরাং মনে হয়, নদীয়াই বাঙ্গালাদেশে বাউলমতের জন্মদাতা, এবং ইহা নিতান্তই সম্ভবপর; কেননা বাঙ্গালাদেশে প্রাচীন সংস্কৃতির (Culture) কেন্দ্র ছিল নদীয়া। এ জেলা হইতে জ্ঞানের কথা, শাস্ত্রের কথা যেমন জন্ম লইয়াছে, তেমন মর্মের কথা, প্রেমের কথাও জন্ম লওয়া নিতান্তই সম্ভবপর।...এক নদীয়ার মধ্যেই, গোবরা, হজরত, খুশী-বিশ্বাস-প্রমুখ মুসলমান, এবং আউলচাঁদ, বীরভদ্র প্রমুখ হিন্দুর চেষ্টায় যে ভাববিদ্রোহী দলগুলি...গঠিত হইল, বাঙ্গালায় বাউল-মতকে প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত করিবার পক্ষে তাহাদের প্রভাব নিতান্তই কম নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে ইহারাই বাউলদল বৃদ্ধি করিতে থাকে।[১]

বৃহত্তর নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া অঞ্চলেই বাউলমতের প্রসার অধিক হয়েছে এবং এই অঞ্চলেই আবির্ভূত হয়েছেন উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক বাউলকবি। এ বিষয়ে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের (১৮৯৯-১৯৭০) অভিমত:

> কুষ্টিয়া অঞ্চল কেবল ভৌগোলিক সংস্থানের জন্যই নহে, অন্যান্য বিশেষ কারণেও নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা প্রভৃতি জেলার কেন্দ্রস্থল। ঐ সমস্ত জেলার মুসলমান ফকির ও বাউলপন্থী হিন্দু বৈষ্ণব প্রভৃতির ধর্ম-সাধনা-বিষয়ে অনুপ্রেরণারও এইটি একটি কেন্দ্রস্থল।

লালন ও বহুসংখ্যক ঐ মতাবলম্বী ফকির এবং গোঁসাই গোপাল ও অন্যান্য বহু বাউলপন্থী রসিক বৈষ্ণবের বাস ও লীলাস্থল এই কুষ্টিয়া অঞ্চল।...কুষ্টিয়া অঞ্চল হইতেই এই ভাবধারা চতুষ্পার্শ্ববর্তী জেলায় ছড়াইয়া পড়ে এবং অনেক মুসলমান ও হিন্দুজাতীয় বাউলের উদ্ভব সম্ভব হয়।[২]

কুষ্টিয়ার খোক্‌সা, কুমারখালী, চাপড়া-ভাঁড়ারা, ছেঁউড়িয়া, হরিনারায়ণপুর, মেহেরপুর ও শিলাইদহ একসময় বাউল-প্রধান অঞ্চল ছিলো।[৩] এ-ছাড়া জানা যায়:

মধ্যবঙ্গে, বিশেষ করিয়া কুষ্টিয়া-অঞ্চলে, এক সময়ে এই বাউল বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ও ফকিরের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। প্রায় প্রতি গ্রামেই ছিল ইহাদের বাস—পল্লী-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইহারা ছিল জড়িত।[৪]

বাউল-ঐতিহ্যের এই প্রেক্ষাপট স্মরণে রেখেই আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯—১৯৮৪) কুষ্টিয়াকে 'বাংলার বাউলের লীলাভূমি' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৫]

কুষ্টিয়ার সন্নিহিত বৃহত্তর যশোর-অঞ্চলও লোকসংস্কৃতি ও মরমী-সাধনার একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। বৃহত্তর যশোর জেলায় জন্মেছেন পাগলা কানাই (১৮০৯—১৮৮৯), দুদ্দু শাহ (১৮৪১—১৯১১), পাঞ্জ শাহের (১৮৫১—১৯১৪) মতো প্রখ্যাত সাধক-কবি। ভাব-সাধনার ক্ষেত্রে এই দুই অঞ্চলের আদান-প্রদানের যোগাযোগ দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত রয়েছে। এই দুই অঞ্চলের সম্মিলনে গড়ে উঠেছিল লোকায়ত ভাবসাধনার একটি প্রেরণা-মণ্ডল। লৌকিক ভাব-সাধনার এই কেন্দ্রীয় ভূমিতেই অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে বাউলসাধনার অবিস্মরণীয় প্রতিভা লালন ফকিরের আবির্ভাব।

জন্ম-প্রসঙ্গ ও জীবন-কাহিনী

এই আত্মনিমগ্ন সংসার-নির্লিপ্ত সাধকের জীবন-কাহিনী রহস্যাবৃত। তাঁর জন্মস্থান ও ধর্মগত জাতি-পরিচয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। লালন নিজেও তাঁর আত্মপরিচয় সম্পর্কে নীরব ও নিস্পৃহ ছিলেন।

তাঁর জীবনীর প্রামাণ্য ও প্রাচীন বিবরণও অতি দুর্লভ। 'হিতকরী' পত্রিকার (১৫ কার্তিক ১২৯৭/৩১ অক্টোবর ১৮৯০) নিবন্ধ, সরলা দেবীর (১৮৭২-১৯৪৫) প্রবন্ধ ('ভারতী', ভাদ্র ১৩০২), মৌলবী আবদুল ওয়ালীর (১৮৫৫—১৯২৬) প্রবন্ধ ('Journal of the Anthropological Society of Bombay', Vol. V. No. 4; 1900.), বসন্তকুমার পালের (১৮৯৫-১৯৭৫) প্রবন্ধ ('প্রবাসী' : শ্রাবণ ১৩৩২ ও বৈশাখ ১৩৩৫) ও বই ('মাহাত্মা লালন ফকির', ১৩৬২) এবং মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের (১৯০৪-১৯৮৭) 'হারামণি' (২য় খণ্ড: ১৯৪২, ৪র্থ খণ্ড: ১৯৫৯, ৭ম খণ্ড: ১৩৭১) গ্রন্থে লালনজীবনীর কিছু নির্ভরযোগ্য উপকরণ পাওয়া যায় যার সাহায্যে লালনজীবনীর একটি কাঠামো নির্মাণ সম্ভব। অবশ্য এই প্রয়াস যে অসম্পূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। লালনের জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে কোনো সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না বলে গবেষকদের অনেক-ক্ষেত্রেই জনশ্রুতি কিংবা অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়।

লালন শাহ ১৭৭৪ সালে বর্তমান কুষ্টিয়া (তৎকালীন নদীয়া) জেলার অধীন কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত গড়াই নদীর তীরবর্তী ভাঁড়ারা গ্রামে (চাপড়া গ্রামসংলগ্ন) জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভ্রান্ত হিন্দু কায়স্থ পরিবারের সন্তান লালনের পিতা-মাতার নাম যথাক্রমে মাধব কর ও পদ্মাবতী।* জানা যায়, লালন পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হন। আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করতে পারেননি। চাপড়ার ভৌমিক-পরিবার তাঁর মাতামহ-বংশ। চাপড়া-ভাঁড়ারা গ্রাম ছিলো লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র। বাউলসঙ্গীত কবিগান হরিকীর্তনসহ নানা লোকসঙ্গীতের বিশেষ চর্চা ও চল ছিলো এইসব গ্রামে। এই সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের পরিবেশেই লালনের জন্ম।

লালন বাল্যকাল থেকেই ধর্মপরায়ণ ও গীতবাদ্যপ্রিয় ছিলেন। কীর্তন কবিগানের আসরে লালনের বিশেষ খ্যাতি ছিলো। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অল্প বয়সেই তাঁর উপর সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে। ইতোমধ্যে তাঁর বিবাহও হয়। সাংসারিক চিন্তা ও আত্মীয়বর্গের বৈরিতা তাঁকে বিশেষ পীড়িত করে তোলে। জ্ঞাতি কুটুম্বদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় লালন

তাঁর মা ও স্ত্রীকে নিয়ে ভাঁড়ারা গ্রামের অভ্যন্তরেই দাসপাড়ায় স্বতন্ত্রভাবে বসবাস শুরু করেন।

এই দাসপাড়ারই বাসিন্দা প্রতিবেশী বাউলদাসের সঙ্গে অন্যান্য সঙ্গীসহ লালন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে গঙ্গাস্নানে যান। কেউ কেউ অবশ্য নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান বা তীর্থভ্রমণের কথাও বলে থাকেন। হিন্দুতীর্থ শ্রীক্ষেত্র গমন সম্পর্কেও একটি মত প্রচলিত আছে। যাই হোক, তীর্থভ্রমণ বা গঙ্গাস্নান সেরে গৃহে ফেরার পথে লালন বসন্তরোগে গুরুতররূপে আক্রান্ত হন। রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সহযাত্রীরা লালনকে মৃত মনে করে এই সংক্রামক রোগের ভয়ে অতি দ্রুত কোনোরকমে মুখাগ্নি করে তাঁকে নদীতে নিক্ষেপ করে। মতান্তরে সঙ্গীরা তাঁকে অন্তর্জলি করে। তারপর তারা ভাঁড়ারায় ফিরে গিয়ে লালনের মা ও স্ত্রীর নিকটে লালনের মৃত্যুসংবাদ পরিবেশন করে। সকলেই তখন লালনের দুর্ভাগ্যজনক অকালমৃত্যুকে স্বীকার করে নেয়।

এদিকে লালনের সংজ্ঞাহীন দেহ ভাসতে ভাসতে কূলে এসে ভেড়ে। একজন তন্তুবায় মুসলমান রমণী জল নিতে এসে মুমূর্ষু লালনকে দেখতে পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে নিজ গৃহে নিয়ে যান। এই রমণীর আন্তরিক সেবা-শুশ্রূষায় লালন রোগমুক্ত হন। কিন্তু বসন্তরোগে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায় এবং মুখমণ্ডলে গভীর ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি হয়। আরোগ্যলাভের পর লালন ভাঁড়ারায় নিজ গৃহে ফিরে যান। তাঁর আকস্মিক ও অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনে তাঁর মা ও স্ত্রী যুগপৎ আনন্দ বেদনা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। কিন্তু গ্রামের সমাজপতি ও আত্মীয়-স্বজন মুসলমানের গৃহে অন্ন-জল গ্রহণের অপরাধে এবং পারলৌকিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্নের পর তাঁকে সমাজে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সমাজ ও স্বজন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত লালন ব্যথিত ও অভিমানক্ষুব্ধ হয়ে চিরতরে গৃহত্যাগ করেন। এই ঘটনায় সমাজ-সংসার, শাস্ত্র-আচার ও জাত-ধর্ম সম্পর্কে লালন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এখান থেকেই তাঁর মনে বৈরাগ্য-ভাবের উদয় হয়। সাম্প্রদায়িক জাত-ধর্ম ও গোত্র-কুল সম্পর্কে তাঁর গানে যে তীব্র অনীহা ও অসন্তোষ ফুটে উঠেছে তার পেছনে যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মর্মান্তিক ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতার একটা প্রভাব ছিলো তা সহজেই অনুমেয়।

গৃহত্যাগের সময় লালনের স্ত্রী তাঁর অনুগামিনী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজ-সংসার অনুকূল না হওয়ায় তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি জানা যায়:

> ...ইহার পর লালন যখন সেঁউড়িয়া গ্রামে আখড়া স্থাপন করেন, এই পতিপ্রাণা রমণী তখনও স্বামীর ধর্মভাগিনী হতে বহুবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু সমাজের মুখ চাহিয়া আত্মীয়-স্বজন কেহই তাঁহার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইতে দেন নাই। ইহার সামান্য কয়েক বৎসর পরেই লালনের স্ত্রী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক স্বীয় হৃদয়ের গভীর বেদনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।[৭]

এরপর লালনের নিরাশ্রয় নিঃসঙ্গ জননী 'ভেকাশ্রিতা' হয়ে ভাঁড়ারার বৈরাগী 'শুম্ভমিত্রের আখড়ায়' জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করেন। এই আখড়াতে তাঁর মৃত্যু হলে "সেঁউড়িয়া আখড়া হইতে আহার্যসামগ্রী পাঠাইয়া সাঁইজী স্বীয় জননীর মহোৎসবাদি যথাবিধি সুসম্পন্ন করান।"[৮]

লালন তাঁর যৌবনের মধ্যভাগে গৃহত্যাগ করেন। সমাজ-সংসার-বিচ্যুত লালন জগৎ ও জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পেলেন সিরাজ সাঁই নামক এক তত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধ বাউলগুরুর সান্নিধ্যে এসে। লালন এই সিরাজ সাঁইয়ের নিকটেই বাউল মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষালাভের পূর্বে হয়তো বা তাঁর ধর্মান্তর ঘটে থাকতে পারে। এর পেছনে স্বজন-স্বজাতির হৃদয়হীন প্রত্যাখ্যানের বেদনা হিন্দুধর্মের ছুঁৎমার্গ ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের নির্মম অভিজ্ঞতা এবং হিন্দুসমাজে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাহীনতা প্রধানত কাজ করেছিল। বাউল-মতবাদে দীক্ষা প্রাপ্তির পর লালন আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে পড়েন।

লালন-গুরু সিরাজ সাঁইয়ের পরিচয় নিয়েও মতভেদ আছে। মৌলবী আবদুল ওয়ালী যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হরিশপুর গ্রামে সিরাজ সাঁইয়ের জন্ম বলে উল্লেখ জন্ম বলে উল্লেখ করেছেন। মুহম্মদ আবু তালিব (জ. ১৯২৮), খোন্দকার রিয়াজুল হক (জ. ১৯৪০) ও এস. এম. লুৎফর রহমান (জ. ১৯৪১) এই মতের সমর্থক। বসন্তকুমার পাল তাঁর জন্মগ্রাম নির্দেশ করেছেন যশোর জেলার ফুলবাড়ী গ্রামে। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রথমে কুষ্টিয়ার হরিনারায়ণপুর ও পরে কুমারখালী সিরাজ

সাঁইয়ের বাসস্থান বলে মত পোষণ করেছেন। ভোলানাথ মজুমদারের বরাত দিয়ে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন ফরিদপুর জেলার কালুখালি স্টেশনের সন্নিকটে কোনো গ্রামে তাঁর নিবাস ছিলো। আহমদ শরীফ (জ.১৯২১) এই তথ্য গ্রহণ করেছেন। সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯২৩—?) অপরপক্ষে দাবী করেছেন সিরাজ সাঁই পাবনা জেলার অধিবাসী। আনোয়ারুল করীমের মতে তাঁর জন্মস্থান যশোর জেলার ফুলবাড়িয়া গ্রাম।

বাউল-মতবাদে দীক্ষাগ্রহণের পর গুরুর নির্দেশে লালন কুষ্টিয়া শহরের নিকটবর্তী ছেঁউড়িয়া গ্রামে এসে ১৮২৩ সাল নাগাদ আখড়া স্থাপন করেন। প্রথমে তিনি "ছেঁউড়িয়া গ্রামের ভিতর যে গভীর বন ছিল সেই বনের একটী আম্রবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া সাধনায় নিযুক্ত হন।"[৯] পরে স্থানীয় কারিকর সম্প্রদায়ের উদার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা তিনি লাভ করেন। এঁদের দানে-অনুদানেই গড়ে ওঠে ছেঁউড়িয়ার আখড়া। ছেঁউড়িয়া-অঞ্চল কারিকর-প্রধান। এই গ্রামের অধিবাসীরা, বিশেষ করে কারিকর-সম্প্রদায়, লালনকে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। প্রায় প্রতিটি কারিকর-পরিবারেই লালনের শিষ্য-ভক্ত ছিলো। প্রকৃতপক্ষে এঁদের আন্তরিক সহযোগিতা লালনের প্রতিষ্ঠার পথকে যে সুগম করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অল্পদিনেই লালনের প্রভাব ও পরিচিতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি লোকায়ত বাঙলার শ্রেষ্ঠ বাউলগুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এ-সম্পর্কে জানা যায়:

> লালন প্রথম প্রথম সেঁউড়িয়ায় খুব কম থাকিতেন। চতুষ্পার্শ্ব-বর্তী অঞ্চলে—পাবনা, রাজশাহী, যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায়—শিষ্যগণের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেন ও তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতেন। সেইসময় বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাহার মধ্যে মুসল-মানের সংখ্যাই বেশী। অল্পসংখ্যক হিন্দু-সমাজের তথাকথিত নিম্ন-শ্রেণীর লোকও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। একসময় এই মধ্যবঙ্গে এই 'নেড়ার ফকির'দের সংখ্যা খুব বেশী ছিল।
>
> ৪০/৫০ বৎসর পূর্বেও এই অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ১০জন এই মতাবলম্বী ছিল। লালনের সমসাময়িক বা পরবর্তীকালে এই মতের দু'চারজন গুরুর উদ্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু লালনই ছিলেন এ অঞ্চলে এই মতবাদের একজন শক্তিশালী আদিগুরু ও প্রচারক।[১০]

'হিতকরী' পত্রিকা, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১—১৯৩০) বসন্ত-কুমার পাল, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, সৈয়দ মুর্তাজা আলী (১৯০৩—১৯৮১), এ. এইচ. এম. ইমামউদ্দীন (১৯১০-১৯৮৯), শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১—১৯৬৪), বিশ্বনাথ মজুমদার, অন্নদাশঙ্কর রায় (জ. ১৯০৪), বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০), আহমদ শরীফ, শেখ মোঃ আবুল হোসেন আলকাদেরী, সনৎকুমার মিত্র (জ. ১৯৩৩), আনিসুজ্জামান (জ. ১৯৩৭) প্রমুখ গবেষকের রচনায় লালনের উপরিউক্ত জীবন-কাহিনীর সমর্থন মেলে। এঁদের রচনা থেকে অন্তত কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যায়: ক. লালনের জন্ম ভাঁড়ারায়, খ. লালন হিন্দু কুলোদ্ভব, গ. লালন ধর্মান্তরিত হন, ঘ. তীর্থভ্রমণ বা গঙ্গাস্নানে গিয়ে লালন বসন্তরোগে আক্রান্ত হন এবং এরপর সাধনজীবনের অনুকূলে তাঁর জীবনে নাটকীয় পরিবর্তন আসে।

জন্মস্থান ও ধর্মপরিচয়ঃ ভিন্নমত

লালনের জীবনী সম্পর্কে বিশেষ করে জন্মস্থান ও ধর্মগত জাতি-পরিচয় নিয়ে পূর্বোক্ত মতের বিরোধী একটি ধারণাও প্রচলিত আছে। মৌলবী আবদুল ওয়ালী তাঁর এক প্রবন্ধে লালনের জন্ম যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হরিশপুর গ্রামে বলে উল্লেখ করেন। তবে ওয়ালী সাহেব লালনের ধর্ম পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁকে 'known as kayastha' বলে অভিহিত করেছেন।[১২]

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) তাঁর 'ব্রহ্মাণ্ডবেদের দ্বিতীয় ভাগ প্রথম সংখ্যায় যোগতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে এক উপ পাদটীকায় লালন সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন:

> নূরনবী হজরৎ মহম্মদের পরে মোশলমানকুলে আর কোন ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই, কেহ পাছে এরূপ মনে করেন, সেই আশঙ্কায় আমরা বলিতেছি যে, মহম্মদের পর অনেক ভক্ত মোশল্মানকুল পবিত্র করিয়াছিলেন। অনেক ভক্ত ফকীরের বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন।...নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া বিভাগের নিকটবর্তী ঘোড়াই গ্রামে লালন সাঁই নামে যে ফকীর বাস করেন, তিনিও পরমভক্ত যোগী। তাঁহার গুরু সিরাজ সাঁই সিদ্ধযোগী ছিলেন।[১২]

'ঘোড়াই গ্রামে' লালনের বাস করার কাঙাল-প্রদত্ত তথ্যটি কৌতূহলোদ্দীপক। অনুসন্ধানে জানা যায়, লালন কখনোই এই গ্রামে আখড়া স্থাপন বা বাস করেননি।

এ.কে. এস. নূর মোহাম্মদ 'মাসিক মোহাম্মদী'তে (আষাঢ় ১৩৪৮) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ('লালন ফকির হিন্দু না মুসলমান?') লালনকে যশোর জেলার ফুলবাড়ী গ্রামের এক মুসলমান তন্তুবায় পরিবারের সন্তান বলে ধারণা করেছেন। হরিশপুরনিবাসী সাধককবি পাঞ্জু শাহের পুত্র খোন্দকার রফিউদ্দীনও (১৯০৪—?) লালন মুসলিম-সন্ততি ও তাঁর জন্ম হরিণাকুণ্ডু থানার হরিশপুর গ্রামে বলে মত পোষণ করেন। এ-সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন:

> সিরাজ সাঁই সম্বন্ধে ও সেইসঙ্গে লালনের সম্বন্ধে অন্য অঞ্চল হইতে আর একটি কথাও শোনা যায়। এই মতবাদের প্রধান প্রচারক পাঞ্জ শাহের সুযোগ্য পুত্র...রফিউদ্দীন খোন্দকার সাহেব। তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, সিরাজ যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামের একজন পাল্কীবাহক ছিলেন। লালনও ঐ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। লালন অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণার বশবর্তী হইয়া গান রচনা করিতেন। কিন্তু তাহার তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য করিতেন না। একদিন পাল্কীবাহক সিরাজ লালনকে তাহারই রচিত একটি গানে অর্থ ও ইঙ্গিত বুঝাইয়া দিতে বলেন, কিন্তু লালন তাহা সম্যকরূপে পারেন না। তখন সিরাজ তাহার প্রকৃত অর্থ বলিয়া দিয়া লালনকে বিস্মিত করেন।...

নানা কারণে এই বিবরণটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।[১৩]

আনোয়ারুল করীমও (জ. ১৯৩৭) তাঁর 'বাউল কবি লালন শাহ' গ্রন্থে লালনের জন্ম কুলবেড়ে হরিশপুরের এক মুসলিম তন্তুবায় পরিবারে বলে উল্লেখ করেন।[১৪] পরে অবশ্য তিনি তাঁর এই মত পরিবর্তন করেন। তাঁর বর্তমান ধারণা:

> আমি দীর্ঘ ২০ বৎসর লালন ফকিরের জীবনী সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করে বেড়িয়েছি। কিন্তু তাঁর জাতিত্ব অথবা জন্মস্থান সম্পর্কে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে আজও উপনীত হতে পারিনি।[১৫]

মুহম্মদ আবু তালিব, এস.এম. লুৎফর রহমান ও খোন্দকার রিয়াজুল হক— এই তিন লালনগবেষক লালনের জন্ম হরিশপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে বলে মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে লালনের পিতার নাম দরিবুল্লাহ দেওয়ান ও মাতা আমিনা খাতুন। এই মতের সমর্থনে তাঁরা প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেছেন লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহ লালনজীবনীর একটি কলমী পুঁথি। লুৎফর রহমান ১৪৮ চরণের এই পুঁথিটি প্রকাশ করেন 'সাহিত্য পত্রিকা'য় (বর্ষা ১৩৭৪)।

কিন্তু অধিকাংশ লালন-গবেষক ও পুঁথি-বিশেষজ্ঞ দুদ্দু শাহ রচিত লালন জীবনীর এই পুঁথির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করে একে বাতিল করে দিয়েছেন। এর হস্তলিপি, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে এই পুঁথি যে বিশেষ 'উদ্দেশ্য সাধন-মানসে' তৈরী করা সে-সম্পর্কেও গবেষকরা মত প্রকাশ করেছেন। এই পুঁথি সম্পর্কে আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, "'লালনচরিত' এর অকৃত্রিমতা নানা কারণে বিশ্বাসযোগ্য নয়"।[১৬] বর্তমান লেখককে লিখিত এক পত্রে এই পুঁথি কেন 'বিশ্বাসযোগ্য' নয় তার যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন:

> ডক্টর এস. এম লুৎফর রহমান আমাকে এ তথাকথিত দুদ্দু রচিত লালন-জীবনী দেখিয়েছিলেন ও পড়িয়েছিলেন। আমি একে প্রয়োজনে পরিকল্পিত বানানো দলিল বলেই মনে করি আমার অবিশ্বাসের কারণ-গুলো এই:
>
> ১. পাকিস্তান আমল থেকে মুসলিম বিদ্বান গবেষকরা তান্ত্রিক বৌদ্ধের বিবর্তিতশাখা এবং চর্যাগীতি ঐতিহ্যের মহাযানী বজ্রকুলজ বাউলদের মুসলিম ও সূফীদরবেশ বলে দাবি করতে থাকেন। তাই 'অলস সাঁই' —(অলখ স্বামী ইশ্বর)-এর ব্যাখ্যা না দিয়েই সাঁই (স্বামী)-কে 'শাহ' বানান। সাঁই হচ্ছেন মর্তাগুরু বা সাধক। রস-রতি, নীর-ক্ষীর, রজঃ-শুক্র, নাদ-বিন্দু, কিংবা রাধা-কৃষ্ণ, হর-গৌরী, মুহম্মদ-খাদিজা, আলি-ফাতেমা, বজ্র-তারা, প্রজ্ঞা-উপায়, পুরুষ-প্রকৃতি যে সূফীমতের রূপক হতে পারেনা, অজ্ঞাতবশে তা তাঁরা বোঝেননা।
>
> ২. পাঁচু (পাঞ্চু), দুদ্দু, লালন,—এগুলো কি মুসলমানের নাম? সূফী-দরবেশ মুসলিম নাম? যাঁর পিতামহের নাম গোলাম কাদের এবং পিতার

নাম দবীরুল্লাহ (দবির কোন ভাষার শব্দ—এর অভিধা কি?—দবীরুল্লাহ কি?) দেওয়ান, মায়ের নাম আমিনা; তাঁর নাম 'লালন' হয় কি করে? তা ছাড়া যিনি নায়েব, প্রতিনিধি, সর্দার কিংবা ধনাঢ্য মানী ব্যক্তিরূপে 'দেওয়ান' পদবী যোগে স্থানীয়ভাবে সমকালে পরিচিত, তাঁর বাড়ির নাম ও গ্রাম আজো স্থানীয়ভাবে পরিচিত বা চিহ্নিত থাকার কথা। 'দেওয়ান'-বাড়ির অন্য লোকেরা কি সব মৃত? হরিশপুরে উনিশ শতকী 'দেওয়ান' বাড়ির বা বংশের হদিস মেলে কি?

৩. দুদ্দু সাঁই গান বাঁধিয়ে লোক ছিলেন, তাঁর পদ্য এমন আড়ষ্ট এবং ছন্দ ও ধ্বনিচেতনাহীন হল কেন?

৪. মতলবে দলিল বানানোর জন্যে যে সব কথা আবশ্যিক বিবেচিত হয়েছে ঠিক সে কথাগুলোই রয়েছে। অথচ স্বতোস্ফূর্ত রচনা হলে ভক্তহৃদয়ের আবেগ উচ্ছ্বাসময় অলীক ও অলৌকিক কিছু গল্প-কাহিনী-ঘটনার বয়ানও থাকত। এ বানানো দলিলে অবশ্যই 'সাই' 'সাঁইজি' আছে, 'শাহ' নেই।

৫. আবার গুরুত্ব বাড়াবার জন্যে দুদ্দু বলছেন,—লালনের 'আত্মকথা' অপ্রকাশিত রাখার নির্দেশ ছিল। কিন্তু কেন?—তা ব্যাখ্যাত হয়নি। এখানে কি 'বাতেনি' কিছু আছে? প্রকাশ করার ইচ্ছেই যদি নেই, তা হলে 'আত্মকথা' ব্যক্তই বা করা হল কেন? তাছাড়া দুদ্দু সাঁই নির্ভয়ে নির্দেশভঙ্গই বা করলেন কেন? জীবিতকালেই যাঁর পরিচিতি গোপন রইল, মৃত্যুর পরে তা' জানানোর প্রয়োজনটাই বা কি ছিল? কার আগ্রহে প্রয়োজনে এ প্রয়াস ও প্রকাশ?—এমনি অনেক জিজ্ঞাসা জাগে।

৬. এ আত্মকথা যে বানানো তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ চব্বিশ পরগণা বিভক্ত হয়ে ১৮৮৬ সনে যশোহর জিলা গঠিত হয়। দুদ্দু বলছেন,—১১৮৯ সালের পয়লা কার্তিকে লালনের জন্ম হয় অর্থাৎ ১৭৭২ সনে বা খ্রীষ্টাব্দে। তা হলে লালনের জন্ম হয় ২৪ পরগণা জিলার খুলনা মহকুমায় (১৮৬০—৬১ সনে গঠিত), এবং খুলনা জিলার রূপ পায় ১৮৮২ সনে। ১৮৮৩ সনে নদীয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে বনগাঁও-কে যশোহরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। উনিশ শতকের

শেষ দশকে বৃদ্ধ দুদ্দুর এসব খবর জানা থাকা উচিত ছিল। ঝিনাইদহ প্রথমে খুলনা মহকুমাভুক্ত থাকে, পরে যশোহর জিলাভুক্ত হয়।

এসব নানা কারণে দুদ্দুর নামে একালের কোন স্বল্পবুদ্ধি যশোহরী ও ইসলামগৌরবগর্বী গবেষকই এ জীবনী তৈরী করেছেন বলে আমাদের ধারণা। এতে ছেঁওড়িয়ার, হিন্দুর ও বাউলের দাবি বাতিল করে ঝিনাইদহের, হরিশপুরের, ও সূফীর দাবি প্রতিষ্ঠা সম্ভব ও সহজ বলে মনে করা হয়েছে।[১৭]

বাউল-গবেষক এ. এইচ. এম. ইমামউদ্দীনও নানা যুক্তি প্রদর্শন করে দুদ্দু শাহের এই পুঁথিকে "অতি আধুনিককালের কোন অজ্ঞাত কবির রচিত" বলে মন্তব্য করেছেন।[১৮] এ প্রসঙ্গে আনোয়ারুল করীম বলেছেন, "নানা কারণে এই পাণ্ডুলিপিটি দলিল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।"[১৯] সনৎকুমার মিত্রও দুদ্দু শাহের পুঁথিকে 'জাল' বলে 'পরিত্যাগ' করার কথা বলেছেন।[২০]

লালন নামে একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্বও অনেকসময় বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে। তবে হরিশপুরের কথিত লালন যে বাউলসাধক লালন নন সে-সম্পর্কে লালনের প্রথম জীবনীকার বসন্তকুমার পাল বর্তমান লেখককে এক পত্রে জানান:

> হরিশপুরে লালন ফকির নামে যিনি প্রকট হইতেছেন তিনি আমার লিখিত পুস্তকের মহাত্মা লালন ফকির নহেন। যাহাতে দুই লালন একত্র মিশিয়া না যায় এজন্য (তারাপদ) শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে সাবধান করিয়া দেন।[২১]

মরমীসাধনার ঐতিহ্যমণ্ডিত হরিশপুরকে লালনের জন্মস্থান হিসেবে দাবী করার পেছনে আঞ্চলিকতা ও জাতিগত গৌরববোধের ভূমিকাই প্রধানত কাজ করেছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ধারণা:

> ...হরিশপুর যে একসময় সমগ্র মধ্যবঙ্গের মধ্যে এই মতাবলম্বী ফকির-দের একটা প্রধান আড্ডা ছিল এবং এই মতের অনেক হিন্দুসাধকও সেখানে বাস করিত এবং সম্মিলিতভাবে একই তত্ত্বালোচনা ও ধর্ম-সাধনা করিত এবং লালনের অনেক শিষ্যও এখানে বাস করিত, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। লালনের পরে বিখ্যাত ফকির পাঞ্জ শাহও এই হরিশপুরেই বাস করেন এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ

পর্যন্ত এই মতাবলম্বী বহু মুসলমান ফকিরের আস্তানা এই গ্রামে বর্তমান দেখিয়াছি। সুতরাং লালনের বাস, এমন কি লালন-গুরু সিরাজ সাঁই-এর বাস এখানে কল্পনা করা অস্বাভাবিক নয়।[২২]

লালন তথা লোকসংস্কৃতিচর্চার প্রবাদ-পুরুষ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন লালনের ধর্ম ও জন্মস্থান সম্পর্কে নতুন মত-প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন:

> ইদানীং এখানে দেখা যাইতেছে অনেকেই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া লালন শাহকে জন্মকাল হইতে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতেছেন ও লালন শাহের জন্মস্থান যশোহরে বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল ইঁহারা সকলেই তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া ছিলেন।[২৩]

সাধন ও সঙ্গীতজীবন

লালন শাহ বাউলসাধনার সিদ্ধ-পুরুষ। কাহার-সম্প্রদায়ভুক্ত বাউলগুরু সিরাজ সাঁইয়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর তাঁর প্রকৃত সাধক জীবনের সূচনা। আনুমানিক বাঙলা ১২৩০ সালে লালন ছেঁউড়িয়ায় এসে স্থায়ী আখড়া স্থাপন করেন। এই গ্রামের তন্তুবায় বা কারিকর সম্প্রদায়ের উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন লালন। জানা যায়:

> ...তিনি সিরাজ সাঁই-এর নিকট উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া লালন শাহ ফকির নাম গ্রহণ করিয়া কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী ছেঁউড়িয়া গ্রামের ভিতর যে গভীর বন ছিল সেই বনের একটা আম্রবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া সাধনায় নিযুক্ত হন। সেই সময় তিনি বন হইতে বাহির হইতেন না। আনমেল নামক একপ্রকার কচু খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। পরে গ্রামস্থ লোকেরা সংবাদ পাইলে ফকীরের অনুমতিক্রমে একটী আখড়া প্রস্তুত করিয়া দেয়। কিছুকাল পরে এখানে একজন বিধবা বয়নকারিণী মুসলমানীকে তিনি নেকাহ্ করেন এবং পানের বরোজ করিয়া তাহার ব্যবসায় করিতে থাকেন। ফকীরকে প্রায়ই দেখা যাইতনা, শুনা যাইত তিনি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া নিজতত্ত্বে মগ্ন থাকিতেন এবং গান রচনা করিতেন।[২৪]

'হিতকরী' পত্রিকা (১৫ কার্তিক ১২৯৭/৩১ অক্টোবর ১৮৯০) লালনের ধর্ম ও সাধনজীবন সম্পর্কে যে টুকরো মন্তব্য পাওয়া যায় তা বিশেষ মূল্যবান:

> তিনি (লালন)...ধর্মজীবনে বিলক্ষণ উন্নত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন ফকীর বড়ই ঘৃণা করিতেন। নিজে লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই; কিন্তু ধর্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্মসাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত...সময় সময় যে উচ্চ-সাধনের কথা ইহার মুখে শুনা যাইত, তাহাতে তাঁহার মত ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত। যাহা হউক তিনি একজন পরম ধাম্মিক ও সাধু ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই।[২৫]

লালন-রচিত সঙ্গীত তাঁর সাধনপদ্ধতিরই ভাষ্য। তাই তাঁর সঙ্গীত ও সাধনজীবন আত্মিকসূত্রে আবদ্ধ। তাঁর রচিত সহস্রাধিক গানে বাউল-সাধনার বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি চমৎকারভাবে বিবৃত হয়েছে সাধনার অবলম্বন হয়েও লালনের প্রতিভার গুণে এগুলো অনবদ্য শিল্পগুণসম্পন্ন হয়ে উঠতে পেরেছে। তাই একদিকে এই গান যেমন তাঁর সম্প্রদায়ের সাধন-সঙ্গীত, অপরদিকে তা বিদগ্ধ রসিকচিত্তের খোরাকও হতে পেরেছে।

তাঁর সঙ্গীত ছিলো অধ্যাত্ম-ভাবাবেগের অনিয় ফসল। তাঁর সঙ্গীতরচনার আন্তর-প্রেরণা কিভাবে লাভ করতো তার বিবরণ:

> তাঁহার অন্তঃকরণের ভাবরাশি যখন দুকূলপ্লাবিণী তটিনীর ন্যায় আকুল উচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠিত, তখন তিনি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিতেন না, শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিতেন, "ওরে আমার পুনা মাছের ঝাঁক এসেছে" শুনিবামাত্র শিষ্যগণ যে যেখানে থাকিত ছুটিয়া আসিত। তখন সাঁইজী তাঁহার ভাবের আবেশে গান ধরিতেন। শিষ্যেরাও যন্ত্রাদির তান লয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়া চলিত। ইহাতে আর সময় অসময় ছিল না। সর্ব্বাদাই এই "পুনা মাছের ঝাঁক" আসিত।[২৬]

লালন মুখে মুখে গান রচনা করতেন, আর তাঁর শিষ্যরা সেগুলো খাতায় লিখে রাখতেন। লিপিকরের কাজ করতেন মানিক শাহ ওরফে মানিক পণ্ডিত ও মনিরুদ্দীন শাহ। ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় লালনের জীবিত-কালে লিপিবদ্ধ কয়েকটি গানের খাতা ছিলো। কিন্তু সে-গুলো নানাভাবে বেহাত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ দু-খানা খাতা নিয়ে যান, যা এখন বিশ্ব ভারতীয় রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত আছে। শিষ্য-ভক্তদের মধ্যেও কেউ কেউ হয়তো এই আদি-খাতা নিয়ে গিয়ে থাকবেন। লালনের গানের সঠিক হিসেব নেই। তবে অনুমান তা নিশ্চয়ই হাজার ছাড়িয়ে যাবে। লালন অনুসারীদের ধারণা এই সংখ্যা দশহাজার। অবশ্য এই ধারণা সমর্থন করার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। বর্তমান লেখক লালন-প্রশিষ্য ইসমাইল শাহ ফকিরের উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে লালনের জনৈক শিষ্যের লিপিকৃত ৫৩০টি লালনগীতির একটি সূচীপত্র সংগ্রহ করেন ১৯৭২ সালে।

লালনের গান তাঁর স্বকালেই যে বিপুল লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল নানা সূত্রে তা জানা যায়। 'হিতকরী'র পূর্বোক্ত তথ্য "লালন ফকীরের অসংখ্য গান সর্ব্বত্রে সর্ব্বদাই গীত হইয়া থাকে।" মৌলবী আবদুল ওয়ালী মন্তব্য করেছেন, "Another renowned and the most melodious versifier, whose dhyas are the rage of the lower classes and sung by boatmen and others was the far famed Lalan Shah" এবং "His disciples are many and his songs are numerous."[২৭] লালনের গান সম্পর্কে দুর্গাদাস লাহিড়ী বলেছেন, "ইহাঁর (লালন) রচিত দেহতত্ত্ববিষয়ক গানগুলি অতি সুমধুর এবং ভক্তিভাব পরিপূর্ণ।"[২৮] অনাথকৃষ্ণ দেবের মন্তব্য "গ্রাম্যসঙ্গীতে লালন শাহী সুরও একসময়ে নাম কিনিয়াছিল।"[২৯]

লালনের দীর্ঘজীবন এই সাধনা ও সঙ্গীতেই নিবেদিত ও সমর্পিত ছিলো। তাই অন্তিম মুহূর্তেও পরমপুরুষের উপলব্ধিতে তাঁর কণ্ঠে জেগেছিল গান লোকান্তরের পাথেয় প্রার্থনায়:

পার কর হে দয়ালচাঁদ আমারে।
ক্ষম হে অপরাধ আমার ভবকারাগারে।।

সাধক লালনের মর্ম-পরিচয় তাঁর গানেই প্রতিফলিত। তাঁকে জানতে চিনতে হলে তাঁর গানই একমাত্র অবলম্বন ও সহায়ক। যথার্থই লালন "গানেই বিভোর ও আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, গানই যেন তাঁহার সাধনার ধারা এবং গানই তাঁহার যোগ।"[৩০]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

দীর্ঘজীবী লালনের চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু ইঙ্গিত 'হিতকরী' (পূর্বোক্ত), বসন্তকুমার পালের রচনা ও লালন-শিষ্যদের বক্তব্য-বিবরণ থেকে পাওয়া যায়। উপরিউক্ত সূত্রের তথ্যাবলি থেকে বলা যায়, লালন ছিলেন ধর্মপরায়ণ, চরিত্রবান, সত্যাশ্রয়ী, অসাম্প্রদায়িক, সংস্কারমুক্ত, তত্ত্বজ্ঞানী, সদ্‌গুরু, প্রচারবিমুখ, মাতৃভক্ত, কর্তব্যনিষ্ঠ ও দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামী।

লালন বাল্যকাল থেকেই ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাই যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি পুণ্য-সঞ্চয়ের মানসে তীর্থভ্রমণ ও গঙ্গাস্নানে যান। এই পর্বেই তাঁর জীবনের নাটকীয় রূপান্তর ও সাধকজীবনে প্রবেশের ঘটনা ঘটে। উত্তরকালে তাঁর সাধকজীবনের পরিচয়ে জানা যায়, "পীড়িতকালেও পরমেশ্বরের নাম পূর্ববৎ সাধন করিতেন...। ধর্মের আলাপ পাইলে নববলে বলীয়ান হইয়া রোগের যাতনা ভুলিয়া যাইতেন।" (হিতকরী)। অবশ্য তাঁর ধর্মচেতনা আনুষ্ঠানিক ধর্মের অন্তর্গত ছিলো না।

লালন ছিলেন পুণ্যাত্মা সচ্চরিত্রের অধিকারী। বাউল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কেউ কেউ অনেকক্ষেত্রে ধর্মসাধনার নামে ইন্দ্রিয়সুখের জন্য 'সাধুসেবা'য় যোগ দিয়ে যে অবাধ ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, লালন ও তাঁর সম্প্রদায় সেই কলঙ্ক থেকে মুক্ত ছিলেন বলে 'হিতকরী' পত্রিকা জানিয়েছে। মিথ্যাচারকেও তিনি কখনো প্রশ্রয় দেননি। 'হিতকরী'র মন্তব্য ' মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন ফকীর বড়ই ঘৃণা করিতেন।"

অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবধর্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ লালন ছিলেন সম্প্রদায়-সম্প্রীতির প্রবক্তা ও হিন্দু-মুসলমান মিলনের সেতুস্বরূপ সর্ব সংস্কার মুক্ত এই মহান সাধক 'জাতিভেদ মানিতেননা' এবং 'সকল ধর্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত'। ('হিতকরী')।

নিরক্ষর লালন বিস্ময়কর তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। 'হিতকরী' সূত্রে জানা যায়, "নিজে লেখাপড়া জানিতেননা ; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত লালন প্রতিকৃতি

গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই, কিন্তু ধর্ম্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত।"

প্রচারবিমুখ মৃদুস্বভাবী এই সাধক নীরবে-নিভৃতে সাধনায় আত্মনিমগ্ন থাকতেই পছন্দ করতেন। তাই সাধনক্ষেত্রে অতীত জীবনের পরিচয় প্রদানে অনিচ্ছুক ছিলেন। নিজের জাত-ধর্ম প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁর কোনো জবাব না দিয়ে বরঞ্চ এই প্রবণতাকে অসার বিবেচনা করে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ ও ধর্মীয় গণ্ডির ঊর্দ্ধে নিজেকে একজন 'শুদ্ধ মানুষ' বলে পরিচয় দিয়েছেন।

মাতৃভক্ত ও পল্লীপ্রেমিক লালনের কর্তব্যচেতনা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিরাশ্রয়-নিঃসঙ্গ 'ভেকাশ্রিতা' জননীর দেহত্যাগের পর "সেঁউড়িয়া আখড়া হইতে আহার্য সামগ্রী পাঠাইয়া সাঁইজী স্বীয় জননীর মহোৎসবাদি যথাবিধি সুসম্পন্ন করান।"[৩১] তাঁর বিষয়-বুদ্ধি ও সাংসারিক বিবেচনার পরিচয় মেলে তাঁর অন্তিম দানপত্রে। জানা যায়, "...ইনি সংসারী ছিলেন; সামান্য জোতজমা আছে; বাটিঘরও মন্দ নহে। জিনিষপত্রও মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থের মত। নগদ টাকা প্রায় ২ হাজার বলিয়া মরিয়া যান। ইহার সম্পত্তির কতক তাঁহার স্ত্রী, কর্তৃক ধর্ম্মকন্যা, কতক শীতলকে ও কতক সৎকার্য্যে প্রয়োগের জন্য ইনি একখানি ফরমনামা করিয়া দিয়াছেন।" ('হিতকরী')। বিষয়ী হলেও লালন বিষয়াসক্ত ছিলেন না।

'পরম ধার্ম্মিক ও সাধু' লালন ছিলেন দশ সহস্র শিষ্যের 'মানবগুরু'। তাঁর কাছে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ছিলো না, ছিলোনা নারী-পুরুষের পার্থক্য। তাই হিন্দু-মুসলমান ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই অনুরাগী ভক্ত-সম্প্রদায়কে তিনি 'সত্য কথন সত্য ব্যবহার' শিক্ষা দিতেন আলাপচারিতায় ও গানের মাধ্যমে। শিষ্য-ভক্তমণ্ডলী তাঁর স্নেহ-প্রীতি-আনুকূল্য থেকে কখনো বঞ্চিত হননি। 'হিতকরী' পত্রিকা লিখেছে, "শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল ও ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন; অন্যান্য শিষ্যগণকে তিনি কম ভালবাসিতেননা। শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহার ভালবাসার কোন বিশেষ তারতম্য থাকা সহজে প্রতীয়মান হইত না।"

লালনের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় মেলে কাঙাল হরিনাথের বাউলগান সম্পর্কে মন্তব্য পেশের মাধ্যমে। একবার 'শখের বাউল' হরিনাথ তাঁর

কয়েকটি গান শুনিয়ে লালনের অভিমত জানতে চান। লালন মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "'তোমার এ ব্যঞ্জন বেশ হইয়াছে, তবে নুনে কিছু কম আছে' (অর্থাৎ ভাষা কিঞ্চিৎ নীরস হইয়াছে)...।"[৩২]

দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামীরূপে লালনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বিস্ময়কর ও ব্যতিক্রমধর্মী। শিলাইদহের ঠাকুর-জমিদাররা কাঙাল হরিনাথের প্রতি ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়েছিলেন তাঁর সম্পাদিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় প্রজা-পীড়নের সংবাদ-প্রকাশের জন্য। হরিনাথকে শায়েস্তা করার জন্য দেশীয় লাঠিয়াল ও পাঞ্জাবী গুণ্ডা নিযুক্ত করেন তাঁরা। লালন ফকির "তাঁর দলবল নিয়ে নিজে লাঠি হাতে সেই লাঠিয়ালের দলকে আচ্ছা করে চিট্ করে সুহৃদ কৃষক-বন্ধু হরিনাথকে রক্ষা করেন।"[৩৩] যে-হাতের একতারা মরমীগানের সুর-মূর্চ্ছনায় মুখরিত, সেই হাতেই প্রয়োজনে উঠে এসেছে প্রতিরোধের লাঠি। শান্ত-সৌম্য-নির্লিপ্ত সাধক লালনের এ এক ব্যতিক্রমী রূপ যা তাঁর সরলরৈখিক চরিত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

শেষজীবন ও মৃত্যু

ছেঁউড়িয়ার আখড়া স্থাপনের পর থেকে জীবনের অন্তিমপর্ব পর্যন্ত লালন ফকির সেখানে সার্বক্ষণিক শিষ্য-ভক্ত পরিবৃত থাকতেন। তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল 'লালন-মণ্ডলি'—'সাঁইর সাধবাজার'। কেবল শিষ্য-ভক্তই নয় অনুরাগী শিক্ষিত গুণীজনের আগমনও ঘটতো তাঁর আখড়ায়। তিনিও যেতেন নানাস্থানে ভিন্ন আখড়ায় কিংবা হরিশপুর, কুমারখালী, শিলাইদহে। বার্ধক্যজনিত শারীরিক অসুবিধা ব্যতীত লালন জীবনসায়াহ্নে পৌঁছেও বেশ শক্ত-সমর্থ ছিলেন। 'হিতকরী' পত্রিকা জানায়, "এই বয়সেও তিনি অশ্বারোহণ করিতে দক্ষ ছিলেন এবং অশ্বারোহণেও স্থানে স্থানে যাইতেন।" তবে শেষ জীবনে তাঁর জীবিকার দায়িত্ব শিষ্য ভক্তরাই গ্রহণ করেন।

মৃত্যুর কিছু পূর্বে এই শতোর্দ্ধ সাধক বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তত্ত্বালাপে মগ্ন হলে তিনি তাঁর রোগ-ব্যাধির কথা বিস্মৃত হয়ে যেতেন। জানা যায়:

> মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতে ইহার পেটের ব্যারাম হয় ও হাত-পায়ের গ্রন্থি জলস্ফীত হয়। দুধ ভিন্ন পীড়িত অবস্থায় অন্য কিছু

খাইতেন না। মাছ খাইতে চাহিতেন। পীড়িতকালেও পরমেশ্বরের নাম পূর্ব্ববৎ সাধন করিতেন; মধ্যে মধ্যে গানে উন্মত্ত হইতেন। ধর্ম্মের আলাপ পাইলে নববলে বলীয়ান হইয়া রোগের যাতনা ভুলিয়া যাইতেন।...মরণের পূর্ব্ব রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫টার সময় শিষ্যগণকে বলেন "আমি চলিলাম।" ইহার কিয়ৎ-কাল পরে শ্বাসরোধ হয়। ('হিতকরী')।

তাঁর অন্তিম-মুহূর্তের বর্ণনায় বসন্তকুমার পাল লিখেছেন:

বঙ্গীয় ১২৯৭ অব্দের কার্ত্তিকের প্রথম প্রত্যুষা, শর্ব্বরীর তিমিরাবগুণ্ঠন এখনও উন্মোচন হয় নাই, তাই বাড়ীঘর, পথঘাট, উদ্যানপ্রান্তর গাশির আলোকমালায় উজ্জ্বলিত; কোথায়ও হরিসঙ্কীর্তন, কোথায় বা শঙ্খধ্বনি; গাশির মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে জড়তা পরিহার করিয়া গ্রামবাসীগণ সকলেই এখন জাগ্রত। এইসময় লালন স্বগৃহে রুগ্নশয্যায় শায়িত কিন্তু নিষ্ক্রিয় বা নীরব নহেন—শিষ্যগণসহ তন্ময়চিত্তে অন্তিম সঙ্গীত ('পার কর হে দয়ালচাঁদ আমারে। / ক্ষম হে অপরাধ আমার ভবকারা-গারে') গাহিয়া চলিতেছেন। প্রভাতরশ্মি পূর্ব্বাশার অন্তর ফুটিয়া লোক-লোচনে দর্শন দিল, সাঁইজীর সঙ্গীতও শেষ হইল, স্বরলহরী থামিয়া গেল, সমস্ত গৃহতল নীরব নিস্তব্ধ, ইহার পর শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া "আমি চলিলাম" বলিয়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে শেষ স্বর উচ্চারিত হইল, নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন, সমাজপরিত্যক্ত দীন ফকিরের জীবননাট্যের যবনিকাপাত হইল।[৩৪]

লালন ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর (১২৯৭ সালের ১ কার্তিক) শুক্রবার ভোর পাঁচটায় ১১৬বছর বয়সে ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিবরণ দিয়ে 'হিতকরী' পত্রিকা লিখেছে:

মৃত্যুকালে কোনো সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল হরেনাম নামও দরকার [হয়] নাই। হরিনাম কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে।

লালনের মৃত্যুর পর পারলৌকিক কল্যাণের জন্য 'শ্রাদ্ধাদি' হয়নি, কেবল 'বাউলসম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব' হয়েছিল। মৃত্যুকালে নিঃসন্তান লালন বিশোখা নামে তাঁর স্ত্রী বা সাধন-সঙ্গিনী বা সেবাদাসী ও পিয়ারী নামে এক ধর্মকন্যা এবং অসংখ্য শিষ্য ও ভক্ত রেখে যান। 'সামান্য জোতজমা', 'বাটীঘর', 'মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থের মত জিনিষপত্র' এবং 'নগদ টাকা প্রায় ২ হাজার বলিয়া মরিয়া যান'। জানা যায়:

> ইঁহার সম্পত্তির কতক তাঁহার স্ত্রী, কতক ধর্মকন্যা, কতক শীতলকে ও কতক সৎকার্য্যে প্রয়োগের জন্য ইনি একখানি ফরমমাত্র করিয়া গিয়াছেন। ('হিতকরী')।

লালনের উত্তরাধিকার

বাউলগুরু লালন শাহের শিষ্য-সংখ্যা ছিলো দশহাজারেরও অধিক—এই তথ্য 'হিতকরী' পত্রিকার। পত্রিকা-সূত্রে আরো জানা যায়:

> লালন ফকীরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেকদূর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহু সংখ্যক লোক এই লালন ফকীরের শিষ্য...।

বাঙলার প্রায় সর্বাঞ্চলেই তাঁর শিষ্য-ভক্ত ছড়িয়ে ছিলো। তাঁর খ্যাতি-মান ও প্রধান শিষ্যদের মধ্যে শীতল শাহ, ভোলাই শাহ, পাঁচু শাহ, পণ্ডিত মানিক শাহ, মনিরুদ্দীন শাহ, কুধু শাহ, মহরম শাহ, জাগো শাহ, আরমান শাহ, দুদ্দু শাহ, বলাই শাহ, কদম শাহ, কানাই শাহ, দয়াল শাহ, মতিজান ফকিরাণী, ভাঙ্গুড়ী ফকিরাণী, কামিনী ফকিরাণী, শান্তি ফকিরাণীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'হিতকরী' পত্রিকা থেকে জানা যায়:

> শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল ও ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন; অন্যান্য শিষ্যগণকে তিনি কম ভাল-বাসিতেন না। শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহার ভালবাসার কোন বিশেষ তারতম্য থাকা সহজে প্রতীয়মান হইত না।

লালন মৃত্যুকালে তাঁর সম্পত্তির কিছু অংশ প্রিয় শিষ্য শীতল শাহকে দান করে গিয়েছিলেন। অপত্য স্নেহের নিদর্শন হিসেবে তিনি তাঁর পালিতা কন্যা পিয়ারীর সঙ্গে ভোলাই শাহের বিবাহ দেন। লালনের মৃত্যুর পর বাউলমহলে শীতল 'বড় ফকির' ও ভোলাই 'ছোট ফকির' নামে পরিচিত ছিলেন। লালনের জমি-পত্তনিদানের একটি পাট্টায় লালনের বকলমে স্বাক্ষর করেন শীতল শাহ।[৩৫] মানিক শাহ পণ্ডিত ও মনিরুদ্দীন শাহ ছিলেন লালনের গানের ভাণ্ডারি—এরা দু'জন গুরুর রচিত গান লিপিবদ্ধ করে রাখতেন।

লালনের মৃত্যুর পর ছেঁউড়িয়ার আখড়াবাড়ীর সম্পত্তি ও নেতৃত্ব নিয়ে লালনশিষ্যদের মধ্যে বিবাদ-বিরোধ দেখা দেয়। একদিকে ছিলেন শীতল ও ভোলাই শাহ এবং অপরদিকে মনিরুদ্দীন শাহ। তবে এই দ্বন্দ্বে শীতল-ভোলাইয়ের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। শীতল ও ভোলাইয়ের মৃত্যুর পর লালনের আখড়াবাড়ীর সম্পত্তি বাকী খাজনার দায়ে লাটে ওঠে এবং ১৯৪৫ সালের ১১ ডিসেম্বর 'লালন শাহ আখড়া কমিটি'র পক্ষে সম্পাদক ইসমাইল শাহ ফকির একশো সাত টাকা চার আনায় নীলামে এই সম্পত্তি খরিদ করে লালনের আখড়ার অস্তিত্ব বজায় রাখেন।[৩৬]

লালনের সাধনতাত্ত্বিক ও সাঙ্গীতিক উত্তরাধিকারের ধারাকে তাঁর শিষ্যবৃন্দ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কেউ কেউ বাউলগুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। সঙ্গীতের মাধ্যমে গুরুর তত্ত্ব ও বাণী প্রচার করেন অনেকেই। ভোলাই শাহ, পাঁচু শাহ, দুদ্দু শাহ গুরুর মতো সাধনতত্ত্ব-বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করেন। এঁদের মধ্যে শিল্পগুণ ও সমাজচেতনায় দুদ্দুর গান বিশিষ্টতার দাবীদার। পাঁচু শাহ স্বল্পসংখ্যক গান রচনা করলেও তাঁর গানে তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় রয়েছে। এ-বিষয়ে পাঞ্জু শাহের নামও উল্লেখযোগ্য, তিনি লালনের দীক্ষিত শিষ্য না হলেও তাঁর পরম ভক্ত ছিলেন, কারো কারো মতে 'ভাবশিষ্য'। তাঁর সঙ্গীত-সাধনায় ছিলো লালনের 'আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা'।[৩৭]

লালনের ভাবাশ্রিত বাউলকবিদের মধ্যে গগন হরকরা (১৮৪০-১৯১০?) ও গোঁসাই গোপালের (১৮৬৯-১৯১২) নামও উল্লেখযোগ্য। গগন হরকরা লালনের অনেক গান জানতেন এবং তা গেয়ে গেয়ে বেড়াতেন। তাঁর নিকট থেকে লালনের গান সংগ্রহ করে করুণাময় গোস্বামী

'প্রবাসী' পত্রিকার (ভাদ্র ১৩২২) 'হারামণি' বিভাগে ছেপেছিলেন। অনুমান হয়, রবীন্দ্রনাথ লালনের গান প্রথম গগনের নিকট থেকেই শুনে থাকবেন এবং তাঁর লালনগীতি সংগ্রহের প্রাথমিক সূত্রও গগন। ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০—১৯৬০) মন্তব্য করেছেন, "লালনের শিষ্যধারার একজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে হরকরা। তাঁহার নাম ছিল গগন।"[৩৮] লালন-প্রভাবিত 'শখের বাউলের'র মধ্যে কাঙাল হরিনাথের নাম করতে হয়। তবে লালনের ভাবাদর্শের শৈল্পিক উত্তরাধিকার সবচেয়ে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথে।

বর্তমানে লালনপন্থীরা মূলত সঙ্গীত-সম্প্রদায় হিসেবে তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন, আর্থ-সামাজিক নানা কারণে সাধনার ধারাটি প্রায় অবলুপ্তির পথে। তবে কিছু প্রবীণ সাধক সাধনার এই ক্ষীণধারাটি পরম মমতায় লালন করে চলেছেন।

লালনের চেহারা ও প্রতিকৃতি

লালনকে যাঁরা প্রত্যক্ষ-দর্শন করেছেন তাঁদের বর্ণনায় লালনের চেহারার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা এ-রকম:

> লালনের চেহারা সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত গায়ক লালনপন্থী ফকির খোদাবক্স শাহ বলেন (১৯৪০ সালে বয়স ৯৭ বৎসর) যে, লালনের মাথায় বাবরী চুল ছিল, মুখে ছিল লম্বা দাড়ি, একটি চক্ষু দৃষ্টিহীন, মুখে অল্প বসন্তের দাগ, আর চক্ষে এক গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। ভোলানাথ মজুমদার মহাশয়ও লালনের ঐরূপ বর্ণনা দেন। তিনি ছেলেবেলায় তাঁহাদের বাড়ীতে লালনকে কয়েকবার দেখিয়াছেন।[৩৯]

লালন তীর্থভ্রমণে গিয়ে ভীষণভাবে যে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তার চিহ্ন আমৃত্যু তাঁর মুখে ছিলো। 'হিতকরী'র নিবন্ধকার যিনি লালনকে 'স্বচক্ষে' দেখেছেন, তিনিও উল্লেখ করেছেন, "ইঁহার মুখে বসন্তরোগের দাগ বিদ্যমান ছিল।" ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১—১৯৩০) লালনের চেহারার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, লালন "সুদীর্ঘ দেহ, উন্নত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, গৌরবর্ণ মুখশ্রী এবং প্রশান্তভাবে"র[৪০] অধিকারী ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯—১৯২৫) শিলাইদহে লালন ফকিরের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। সেই সূত্রে লালনের একটি প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন তিনি। ১৮৮৯ সালের ৫ মে (২৩ বৈশাখ ১২৯৬) 'শিলাইদহ-বোটের উপর' লালনের এই ছবিটি অঙ্কিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রের কালানুক্রমিক তালিকায় দেখা যায় ১৮৮৯ সালে তিনি 'লালন ফকির' নামে একটি চিত্র অঙ্কন করেন।[৪১] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেছেন:

> শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্র-পুস্তকে ইঁহার একটি প্রতিকৃতি দেখিয়াছি তাহাই লালনের পার্থিবদেহের একমাত্র ছায়া—অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাই একমাত্র আদর্শ।[৪২]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত লালনের প্রতিকৃতিটি তাঁর সমকালে প্রচার পায়নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লালনের একটি ছবি এঁকেছিলেন সে-কথা কারো কারো জানা থাকলেও ছবিটি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ খুব বেশিজনের হয়নি। এক সময় এমন ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এই ছবিটি হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেছে।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু (১৮৮৩—১৯৬৬) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই ছবি অবলম্বনে লালন ফকিরের একটি স্কেচ (শিলাইদহ ১৯১৬) করেন। এই স্কেচটিও দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলো। যখন শচীন্দ্রনাথ অধিকারী (১৮৯৭-১৯৭৭?) তাঁর 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লালনের একটি প্রতিকৃতি ছাপতে আগ্রহী হন তখনই নন্দলাল বসুর লালন-স্কেচের খোঁজ পড়ে। ১৯৪৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন থেকে লেখা এক চিঠিতে শচীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন :

> লালন ফকিরের ছবি সম্বন্ধে আমার নিজেরও একটু স্বার্থ আছে, কারণ আমার একখানা বইএ (যাহা এখনও প্রেসে) আমি তাঁহার সম্বন্ধে একটা নূতন তথ্য লিখিয়াছি। পূজনীয় রথীবাবুকে বলিয়াছিলাম তিনি সে ছবির কথা স্মরণ করিতে পারিলেন না, তবে এখানকার রবীন্দ্রভবনের জন্য যখন পুরাতন ছবির বাক্স খোলা হইবে তখন আমাকে সন্ধান লইতে বলিয়াছেন। এখন এখানকার বার্ষিক সম্মেলন ইত্যাদির কাজের খুব ভিড় চলিতেছে। সেজন্য আমি সে ছবির সন্ধান করিতে পারি নাই। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু আমাকে তাঁহার আঁকা (১৯১৩) কয়েকখানা Sketch দিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে তিনি লালন ফকিরের একটা Pencil Sketch আঁকিয়াছিলেন, তাহা যে কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এখানকার কলাভবনের পুরাতন ছবি আমি অনেক খুঁজিয়াও পাই নাই। আর একবার খুঁজিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে।[৪৩]

নন্দলাল বসুর স্কেচটি পরে খুঁজে পাওয়া যায় এবং শচীন্দ্রনাথের গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়। এরপর লালন বা বাউল-সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থে লালনের এই স্কেচটি মুদ্রিত হয় এবং লালনের নির্ভরযোগ্য প্রতিকৃতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

দীর্ঘকাল পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচটি কলকাতার 'রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি'র সংগ্রহশালায় খুঁজে পাওয়া যায়। ক্যাটালগে এই ছবির পরিচিতি নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে; "Sl. No. 1914... Jyotirindranath Tagore Portrait of Lalan Fakir. Pencil—$11\frac{1}{8}'' + 8\frac{1}{2}''$—5th May 1989[৪৪] লালন-গবেষক সনৎকুমার মিত্র বলেছেন, "...দীর্ঘ ছিয়াশী বছর পরে আমি আবার তাকে প্রকাশ্যে লোক-চক্ষুর সামনে হাজির করলাম।"[৪৫] ১৯৭৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউটে 'ইণ্ডিয়ান ফোকলোর কনফারেন্সে' অন্নদাশঙ্কর রায়ের সভাপতিত্বে লালন সম্পর্কে তাঁর একটি প্রবন্ধ পাঠের অনুষঙ্গে এই স্কেচটি প্রদর্শিত হয় বলে অধ্যাপক মিত্র উল্লেখ করেছেন।[৪৬] তুষার চট্টোপাধ্যায় রবিবাসরীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় (৯ শ্রাবণ ১৩৮৩/২৫ জুলাই ১৯৭৬) 'লালন ফকিরের প্রতিকৃতি' নামে এক প্রবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচটি প্রকাশ করেন। পরে তা তাঁর সম্পাদিত 'লালন স্মরণিকা'য়ও ছাপা হয়।[৪৭]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে নন্দলালের স্কেচটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এতে লালনের চেহারার আদল ফুটে ওঠেনি বলেও তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন। তবে ছবি দু'টি পাশাপাশি রেখে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করা যায়, দুটি ছবির অবয়বের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। বৈসাদৃশ্য কেবল ঝুঁটি ও বাবরির মধ্যে। নন্দলাল ছবিটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সম্ভবত বাবরির বদলে ঝুঁটি সংযোজন করে থাকবেন। এই বিবেচনাকে সামনে রেখে হয়তো বলা চলে, নন্দলাল বসু-অঙ্কিত লালন-প্রতিকৃতির সম্পূর্ণই কাল্পনিক, চিত্র বিশেষজ্ঞদের মতামত ব্যতিরেকে এই মন্তব্য সমীচীন নয়।

লালন সমাধি-সৌধ

ছেঁউড়িয়া মৌজায় লালন-ভক্ত মলম শাহ কারিকর লালন ফকিরকে সাড়ে ১৬ বিঘে জমি দান করেন। এই দানকৃত জমির প্রায় অর্দ্ধাংশের ওপর লালনের আখড়া গড়ে ওঠে। স্থানীয় কারিকর-শ্রেণীর ভক্তবৃন্দ লালনের বসবাস ও সাধনার জন্য এই আখড়ায় চতুর্দিকে বারান্দাযুক্ত একটি পূর্বদুয়ারী চারচালা বড়ো খড়ের ঘর তৈরী করে দেন। লালন পরে, যেখানে এখন তাঁর সমাধি আছে, সেখানে একটি গোলাকৃতি বড়ো খড়ের ঘর তৈরী

করে বাস করতে থাকেন। এই ঘরেই তাঁর ভজন-সাধন চলতো মৃত্যুর পর এখানেই তিনি সমাধিস্থ হন।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী বলেছেন:

> রবীন্দ্রনাথ তাঁর [লালন] সমাধির উপরে একটি ছোট পাকা স্মৃতি-মন্দির তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, সম্ভবত ১৩১১ সালে।[৪৮]

কিন্তু এই তথ্য সঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ লালনের সমাধি বাঁধানোর উদ্যোগ নিলেও তা শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ-সমীপে লালন-শিষ্য মনিরুদ্দীন শাহের একটি দরখাস্ত থেকে এই বিষয়ে জানা যায়:

> ...আজ এই দরখাস্ত দ্বারা আবেদন করিতেছি যে, আমার পরমারাধ্য গুরু লালন সাহা ছাহেবের সমাধি পাকা এমারত করাইবার অনুমতি হুজুরের সরকার হইতে পাইয়াছিলাম। হুজুর বিলাত হইতে আসিয়া শ্রীযুক্ত মাননীয় নগেন্দ্রবাবু মহাশয়ের প্রতি ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সমাধিস্থানে গমনপূর্ব্বক দৈর্ঘ-প্রস্থের পরিমাপ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং এষ্টিমেট প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। দুর্ব্বৎসর দেখিয়া শিলাইদহের কাচারির কর্ম্মচারি মহাশয়দিগের কয়েকমাসের জন্য সমাধি পাকা করান বিষয় স্থগিত রাখিয়াছিলেন।... এক্ষণে বর্ত্তমান বৈশাখ মাসের ৯/১০ই তারিখে উক্ত শীতল সাহা ও ভোলাই সাহা নিজ ব্যয়ে ঐ সমাধিস্থান ইষ্টক নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং কার্য্য অর্দ্ধেক পরিমাণ করিয়া তুলিয়াছে। এই কার্য্যে উহারা সরকারের কোন অনুমতি না লইয়া কার্য্যারম্ভ করিয়া পরে হুজুরে দরখাস্ত দিয়া ঐ বিষয় গোচর করিয়াছে। ভোলাই সাহা ও শীতল সাহা পূর্ব হইতে আমার প্রতি ঈর্ষা করিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে আমার প্রার্থনা মতে হুজুরের সরকার হইতে সমাধি পাকা প্রস্তুত হইলে তাহাদের নিজের কোন আধিপত্য থাকিবেনা ও মনিরুদ্দীন সার যশ ও আধিপত্য কায়েম হইবে এই ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া উহা যত সত্বর সমাধা হয় সে পক্ষে বিশেষভাবে যত্ন ও চেষ্টা করিতেছে। আমার বোধ হয় এ কয়েক দিনে উহার কড়িকাট তোলা হইয়া থাকিবে। আরও পরস্পর শ্রুত হইলাম যে "জমিদারবাবুদের তরফ হইতে সমাধিমন্দির প্রস্তুত হইলে আমাদের যে প্রজাই সত্ত্ব আখড়াতে

আছে, তাহা লোপ হইয়া আখড়া জমিদারের খাষ হইয়া যাইবে। এবং মনিরদ্দীন সাহার সুযশ ও আধিপত্য স্থাপিত হইবে। অতএব তাঁহার কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্বেই আমরা যেমন করিয়া পারি সমাধি-পাকা প্রস্তত করাইয়া ফেলিব।" উহারা তাড়াতাড়ী যে মাটির কাদা দিয়া গাঁথনি করিতেছে তাহা অতি কদর্য্য ও অল্পকাল স্থায়ী হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে আমার অন্তঃকরণে যৎপরনাস্থির দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে এবং হুজুরের একটি মহৎকার্য্যের ব্যাঘাত করা হইয়াছে।[৪৯]

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে লালন-সমাধি নির্মাণের 'মহৎকার্য্য' সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। শীতল ও ভোলাই শাহ শেষপর্যন্ত তাঁদের তত্ত্বাবধানে চুণ-সুড়কির গাঁথনিতে এই পাকা সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। এই সমাধি-সৌধ ১৯৪৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে এক প্রচণ্ড বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় —এর দক্ষিণ দিকের অংশ ভেঙে পড়ে। ১৯৪৯ সালে 'লালন শাহ আখড়া কমিটি'র পক্ষে ইসমাইল শাহ ফকির ও কোকিল শাহের বিশেষ উদ্যোগে বিনষ্ট সমাধিসৌধ ভেঙে ফেলে নতুন করে এর নির্মাণ-কাজ আরম্ভ হয়। ২/৩ বছর ধরে ধীরে ধীরে ভক্ত-বৃন্দের সাহায্য-সহযোগিতায় এর কাজ চলতে থাকে। কিন্তু অর্থাভাবে, শেষপর্যন্ত এই পুনরনির্মিত সমাধিসৌধের ছাদ-নির্মাণ কিংবা পলেস্তারা করা সম্ভব হয়নি।

১৯৫৯ সালে মোহিনী মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী (কানুবাবু) (১৯০৭-১৯৬৬) আট হাজার টাকা ব্যয়ে লালন সমাধিক্ষেত্রে একটি সুন্দর সৌধ নির্মাণের উদ্যোগে গ্রহণ করেন। ষাটের দশকের সূচনায় কানুবাবুর ব্যবস্থাপনায় নতুন সৌধ-নির্মাণের জন্য অসমাপ্ত স্মৃতি-সৌধটি ভেঙে ফেলা হয়। কিন্তু এরপর অজ্ঞাত কারণে তাঁর এই উদ্যোগ পরিত্যক্ত হয়।[৫০]

লালনের সমাধিকে কেন্দ্র করে ছেঁউড়িয়ায় একটি সুদৃশ্য সৌধ গড়ে ওঠে ১৯৬৩ সালে, পাশাপাশি নির্মিত হয় লালনচর্চা ও লোকসাহিত্য-গবেষণার জন্য 'লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র'। লালনের বর্তমান সমাধিসৌধ ও লোকসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। তাঁরই প্রস্তাব-মতো জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (বি.এন.আর) এবং স্থানীয় জনগণ ও প্রশাসনের অর্থানুকূল্যে লালন-

স্মৃতিসৌধ ও লোকসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-বিষয়ে কুষ্টিয়ার তৎকালীন জেলা প্রশাসক কিউ.জি.আহাদের অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এম. এ. হাইয়ের নক্শা অনুসারে দিল্লীর প্রখ্যাত মুসলিম-সাধক হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (রহঃ) মকবরার সাদৃশ্যে লালনের এই স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান ১৩ আশ্বিন ১৩৭৩ (১৯৬৩) এই স্মৃতিসৌধ ও লোকসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

লালন স্মৃতিসৌধকে উপলক্ষ করে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্র সম্পর্কে মনসুরউদ্দীনের মন্তব্য :

> লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র স্থাপন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক গৌরবজনক কীর্তি। পূর্বপাকিস্তানে [কিংবা পশ্চিমবঙ্গ] অনুরূপ কোন লোকসাহিত্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় নাই।[৫১]

এই কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে পরে ১৯৭৬ সালে 'লালন একাডেমী' রাখা হয়। কিন্তু সত্যের অনুরোধে এ-কথা বলতেই হয়, যে লক্ষ্য ও ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে—অসীম সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম তা পূরণে সক্ষম হয়নি এই কেন্দ্র বা একাডেমী।

বাউলসাধনা ও লালন শাহ্

বাংলার বাউল-মতবাদের উদ্ভব মধ্যযুগে। তবে এর কালনির্ণয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন, "আনুমানিক ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার বাউল-ধর্ম এক পূর্ণরূপ লইয়া আবির্ভূত হয়।"[৫২] ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের (১৮৬৪—১৯৩৮) ধারণা, "বাউলের জন্ম ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কি ১৫শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। বাউল জন্মগ্রহণ করিয়াছে সিদ্ধা ও মুসলমান ফকীর হইতে।"[৫৩] এ-বিষয়ে আহমদ শরীফের অভিমত, "মোটামুটিভাবে সতেরো শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকেই বাউলমতের উন্মেষ।"[৫৪]

তবে এই অনুমানই অধিক সমর্থনযোগ্য যে, বিভিন্ন পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে এসে চৈতন্যদেবের (১৪৮৬—১৫৩৩) মৃত্যুর পর বাউল-

ধর্ম তার নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করে। বিভিন্ন ধর্ম ও সাধনার প্রয়োজনীয় নির্যাস নিয়ে বাউলমতবাদের সৃষ্টি ও পুষ্টি। তাত্ত্বিক আলোচনার জটিলতার মধ্যে না গিয়ে তাই সাধারণভাবে বলা যায়, প্রধানত বৌদ্ধ সহজিয়া মত, ইসলামী সুফীবাদ ও বৈষ্ণব সহজিয়া মতবাদের সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বাউলধর্ম। মুসলমান ফকির সম্প্রদায়কেই বাউল সাধনার আদি প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। বাউলের সাধনায় যোগ, তন্ত্র, মৈথুন ও সহজসাধনার ধারা এসে মিলেছে।

১৬২৫—৭৫ সালকে মোটামুটি বাউলধর্মের উদ্ভবকাল ধরা হলেও এই সময়ে কোনো বাউলগানের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এমন কী উনিশে শতাব্দীর পূর্বের কোনো প্রামাণ্য বাউলগানও সংগৃহীত হয়নি। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন, ১৬৫০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত প্রায় পৌনে তিনশো বছর বাউলগানের 'উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতির শেষ অবস্থা-কাল'।[৫৫] আহমদ শরীফ যথার্থই বলেছেন, "...উনিশ শতকে লালন ফকিরের সাধনা ও সৃষ্টির মাধ্যমেই এর পরিপূর্ণ বিকাশ।"[৫৬] লালন তাঁর অতুলনীয় সঙ্গীত-প্রতিভা ও তত্ত্বজ্ঞানের সমন্বয়ে বাউলগানের একটি স্বতন্ত্র 'ঘরানা' নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁকে বাউলগানের শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম জনক বললেও অত্যুক্তি হয়না। তাঁর গানে বাউলতত্ত্ব ও সাধনার গভীর পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। বাউলের তত্ত্ব-দর্শন ও সাধনার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও উপলব্ধিতে লালনের গান প্রধান অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত। লালনকে তাই বাউলসাধনার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হিসেবে চিহ্নিত করা চলে।

"বাউলেরা রাগপন্থী। কায়াচার বা মিথুনাত্মক যোগসাধনাই বাউল-পদ্ধতি।"[৫৭] বাউলগানে নানাভাবে এই প্রসঙ্গটি প্রতিফলিত হয়েছে। 'চারিচন্দ্র'-ভেদ কিংবা 'মীন'-ধরা—এই রূপকের ভেতর দিয়ে বাউল-সাধনার মূল বিষয়টি বাউলগানে বিবৃত হয়েছে। 'ত্রিরপিনির তীর-ধারে, মীনরূপে সাঁই বিহার করে'—বাউলের 'অধর মানুষে'র এই হলো গুপ্ত পরিচয়। লালনের গানে এই মীনরূপ সাঁইকে ধরার প্রয়োজন ও কৌশল বর্ণিত হয়েছে:

> সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলেনা।
> জল শুকাবে মীন পালাবে পস্তাবিরে মন-কানা ॥...
> মাস-অন্তে মহাযোগ হয়
> নীরস হতে রস ভেসে যায়

করিয়ে সে যোগের নির্ণয়
মীনরূপে খেল্ দেখ্লেনা ।।

পুরুষ ও প্রকৃতির একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মিলনধারায় এই 'মীনরূপ সাঁই'কে ধরতে হয়। রমণীর ঋতুস্রাবের সপ্তম থেকে নবম দিবসের মধ্যের সময়টিই 'মীন' ধরার প্রকৃষ্ট সময়।

যোগেশ্বরীর সঙ্গে যোগাযোগ করে
মহামহাযোগ সেই জানতে পারে
ও সে তিনদিনের তিন মর্ম জেনে
একদিনেতে সেধে লয় ।।

ঋতুস্রাবের পর তিনদিনের এই বিশেষ সময়কে বাউলরা 'অমাবস্যা' বলেও অভিহিত করে থাকে। লালনের গানে পাওয়া যায়:

মাসে মাসে চন্দ্রের উদয়
অমাবস্যা মাস অন্তে হয়
অমাবস্যা পূর্ণিমার নির্ণয়
জানতে হবে নিহার করে ।।

লালনের জানা আছে:

রস-রতি অনুসারে
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে
রতিতে মতি ঝরে মূল খণ্ড হয় ।।

সাধনার এই পথ সুগম নয়। জটিল ও কঠিন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এই সাধনসিদ্ধি হয়।

সোনার মানুষ ভাসছে রসে।
যে জানে সে রসপন্থী
দেখতে পায় সে অনায়াসে ।।

এই 'সোনার মানুষ' দর্শন ও প্রাপ্তিতে যার একান্ত আকাঙ্ক্ষা, লালন বলছেন, তাকে 'ত্রিবেণী'তে অপেক্ষায় থাকতে হবে।

যৌন-সম্ভোগ নয় যৌণ-সংযম ও কাম-নিয়ন্ত্রণই বাউলের মোক্ষের পথ; 'কামলোভী মনে'র 'মদনরাজার গাঁটরি-টানা'ই যাতে সার না হয় লালন

তাই হদিশ দিচ্ছেন সঠিক পথের :

জেন্তে-মরা প্রেম-সাধন কি পারবি তোরা।
যে প্রেমে কিশোর-কিশোরী হয়েছে হারা ।।
শোসায় শোষে না ছাড়ে বাণ
ঘোর তুফানে বায় তরী উজান
ও তার কাম-নদীতে চর পড়েছে
প্রেম-নদীতে জল পোরা ।।

হাঁটিতে মানা, আছে চরণ
মুখ আছে তার ; খাইতে বারণ
ফকির লালন কয়, এ যে কঠিন মরণ
তা কি পারবি তোরা ।।

লালন কামলোভী ভণ্ড সাধকের কৃত্রিম সাধনাকে ব্যঙ্গ করে তাই বলেছেন, 'প্রেম জানেনা প্রেমের হাটের বুলবুলা', কেননা 'তার মন মেতেছে মদনরসে সদায় থাকে সেই আবেশে'। রিপুর শাসন মানলে সাধন-ভজন সফল হবেনা, বিশেষ করে প্রথম রিপু। 'কামের ঘরে কপাট মারা'র কথা তাই লালনের গানে বারবার উচচারিত হয়েছে।

দম-নিয়ন্ত্রণ অধরাকে ধরার অন্যতম পন্থা। লালনের গানে আছে :

অধরচাঁদকে ধরবি যদি
দম কষে দম সাধন কর।

লালনের গানে ব্যবহৃত 'মহাযোগ', 'অমাবস্যা', 'ত্রিবেণী', 'জোয়ার', 'মীন', 'ফল', 'সুধা', 'নীর-ক্ষীর', 'রাগ', 'রস', 'চন্দ্র' প্রভৃতি বাউল-পরিভাষায় যৌনতা ও মৈথুন-নির্দেশক রূপক শব্দ।

বাউলের সাধনা দেহকেন্দ্রিক। তাই চলতি কথায় বাউলের গানকে দেহতত্ত্বের গানও বলা হয়। এই দেহের মধ্যেই পরম পুরুষ, সহজ মানুষ, রসের মানুষ, অটল মানুষ, অধর মানুষ, ভাবের মানুষ, মনের মানুষ, অচিন পাখি বা সাঁই নিরঞ্জনের গুপ্ত-অবিস্থিতি। দেহবিচারের মাধ্যমে নিজেকে চিনতে আর জানতে পারলেই সেই পরম পুরুষের সন্ধানলাভ সম্ভব। লালনের গানে এই মানবদেহ কখনো 'ঘর' কখনো 'খাঁচা' আবার কখনো বা

'আরশিনগর' নামে অভিহিত হয়েছে। দেহ ঘরের বসতির পরিচয়-সন্ধানের ব্যাকুলতা লালনের গানে প্রকাশিত :

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
তারে জনম-ভর একদিন দেখলাম নারে ॥
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
দেখতে পাইনে এ নয়নে
হাতের কাছে যার
ভবের হাট-বাজার
ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে ॥

'না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আসমানে, অথচ 'খুঁজলে আপন ঘর খানা, তুমি পাবে সকল ঠিকানা'। লালন বলেন, 'সেই মানুষে আছেরে মন, যারে বলে মানুষ-রতন'। কিন্তু,

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে ॥

বাউল মানবদেহকেই পূর্ণতীর্থ বলে মান্য করে। এ-সম্পর্কে লালনের উচ্চারণ :

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে
দেখনা রে মন ভেয়ে।
দেশ-দেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে ॥
করে অতি আজব ভাক্কা
গঠেছে সাঁই মানুষ-মক্কা
কুদরতি নূর দিয়ে।
ও তার চারদ্বারে চার নূরের ইমাম
মধ্যে সাঁই বসিয়ে ॥

এই পরিপ্রেক্ষিতে তাই লালন ঘোষণা করেছেন :

উপাসনা নাইগো তার
দেহের সাধন সর্ব-সার
তীর্থ-ব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সকল মিলে ॥

লালন শাহের জমি পত্তন-দানের পাট্টা

এই দেহতত্ত্বের কথা নানাভাবে লালনের গানে এসেছে। নিজেকে চেনার মধ্য দিয়েই সে অচিন পুরুষের উপলব্ধি—লাভের কথা বিবৃত হয়েছে। তাঁর অবস্থান দূরে নয়, কেবল তাঁকে খুঁজে নিতে হয়। লালন তাই বলেন:

কেন কাছের মানুষ ডাকছো শোর করে।
আছিস তুই যেখানে, সে-ও সেখানে
খুঁজে বেড়াস কারে রে।।

তাঁর অবস্থান 'রঙমহল ঘরে', কিন্তু 'অহর্নিশি পাশাপাশি থেকে দিশে তোর হয়না রে।' তাঁর ভেদের কথা লালন জানিয়েছেন:

ঘরের মধ্যে ঘরখানা
খুঁজে দেখ মন এই থানা
ঘরে কে বিরাজ করে।

এই দেহবিচারের মাধ্যমেই বাউল তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মনের মানুষের সন্ধান সান্নিধ্যলাভের যে প্রয়াস পেয়েছে লালনের গানে তার সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।

বাউল গুরুবাদী লৌকিক ধর্ম। এখানে তাই গুরুবাদের স্থান অতি উচ্চে। গুরু বিনা সাধন-ভজন বৃথা। জানা যায়:

> গুরুকে তারা দুইরূপে দেখে—মানব-গুরু-রূপে আর পরমতত্ত্ব বা ভগবান-রূপে। তাহাদের গানে দুই রূপেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। মানব-গুরুর প্রতি ভক্তি-নিষ্ঠা না হইলে সর্বোচ্চ গুরু ভগবানের অনুগ্রহ-লাভ হয়না। মানব-গুরু সেই পরমগুরুরই প্রতিনিধি।[৩৮]

'হিতকরী' পত্রিকা-সূত্রে (পূর্বোক্ত) জানা যায়, লালন "বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন"। লালনের গানে বাউলসাধনার এই অনুষঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। লালন বলেছেন:

ভবে মানুষ-গুরু নিষ্ঠা যার।
সর্ব-সাধন সিদ্ধ হয় তার।

বাউলসাধনায় গুরুই হলেন সার্বভৌম শক্তি। গুরুর মূল্য-মর্যাদা ও প্রয়োজন-গুরুত্বের কথা লালনের গানে বারবার এসেছে। যেমন:

গুরু-রূপের ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে।
ও তার কিসের আবার ভজন-সাধন লোক-জানিতে ক'রে।।

তাই সেই গুরুর কাছেই লালনের বিনীত নিবেদন:

গুরু সু-ভাব দেও আমার মনে।
তোমায় যেন ভুলিনে।।

গুরু, তুমি নিদয় যার প্রতি
ও তার সদায় ঘটে দুর্মতি
তুমি মনোরথের সারথি
যথা লও যাই সেখানে।।

গুরু, তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী
গুরু, তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী
গুরু, তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী
না বাজাও বাজবে কেনে।।

আমার জন্ম-অন্ধ মন-নয়ন
গুরু তুমি নিত্য সচেতন
চরণ দেখবে আশায় কয় লালন
জ্ঞান-অঞ্জন দেও নয়নে।।

গুরু-বন্দনার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন এই গানটি।

গুরুই সাধকের পরম মূল্যবান সম্পদ ও অবলম্বন। সংসার-ধন কেবল এই 'ভবের ভূষণ', তার মায়ায় ভুলে 'অবোধ মন' গুরুধনকে অবহেলা করে বলেই 'অন্তিমকালে' বিপদ ঘটে। তাই গুরু-নির্ভর লালন বলতে চান:

থাকোরে মন একান্ত হয়ে।
গুরু গোঁসাইর বাক্য লয়ে।।

অনেকক্ষেত্রে বাউল সৃষ্টিকর্তা ও গুরুকে অভিন্ন কল্পনা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস গুরু ঈশ্বরেরই প্রতিচ্ছায়া। লালনের গানে গুরুতত্ত্বের এই বিষয়টি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে:

মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছেরে এ জগতে।

মুরশিদের চরণ-সুধা
পান করিলে হরে ক্ষুধা
কোরো না দেলে দ্বিধা

যেহি মুরশিদ সেহি খোদা
বোঝ 'অলিয়ম মুরশেদা'
আয়েত লেখা কোরানেতে ॥

বাউলধর্ম বেদবিরোধী। বৈদিকধর্মকে বাউলরা তাঁদের সাধনার পরিপন্থী ও অন্তরায় বলে বিবেচনা করেন। এ-বিষয়ে বাউল বিশেষজ্ঞের অভিমত:

> বাউলধর্ম যে বেদ-বহির্ভুত ধর্ম এবং এই ধর্ম-সাধনায় যে বেদ-বিধি ত্যাগ করিতে হইবে—এইরূপ ভাব অনেক গানে ব্যক্ত হইয়াছে। বেদ-বিধি-অর্থে, বাউলরা অনেক স্থলে চিবাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম বুঝিয়াছে। তাহাদের আচাব 'রাগের আচার', 'বেদের আচার' নয়।[৫৯]

বাউলের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়েছে:

তাইতে বাউল হইনু ভাই
এখন বেদের ভেদ-বিভেদের
আর তো দাবী-দাওয়া নাই।

লালনের গানে এই বেদ-বিবোধিতার দৃষ্টান্ত প্রচুর।

"বাউলেরা বৈধি তথা বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য আচারবিরোধী।" তাই[৬০] লালন সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'বেদ-বেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লক্ষণা।' সেইসঙ্গে আরো বলেছেন:

জান গে মানুষের করণ কিসে হয়।
ভুলোনা মন বৈদিক ভোলে
রাগের দরে রও ॥

বেদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাই এই খণ্ডিত জ্ঞানের সাহায্যে মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। লালনের বক্তব্য:

বেদে কি তার মর্ম জানে।
যেরূপ সাঁইর লীলা-খেলা
আছে এই দেহ-ভুবনে ॥
পঞ্চতত্ত্ব বেদের বিচার
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার

মানুষ-তত্ত্ব ভজনের সার . . . . .
বেদ ছাড়া বৈ রাগের মানে ॥

বেদের জ্ঞান সাধককে কখনো সঠিক পথের সন্ধান দিতে সক্ষম নয়; —বরঞ্চ একধরনের বিভ্রান্তিরই জন্ম দেয়। পরমতত্ত্বের রহস্যভেদাকাঙ্ক্ষী লালন তাই আফসোস্ করে বলেন:

কার বা আমি কে বা আমার
আসল বস্তু ঠিক নাহি তার
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয়না দিনমণি ॥

বাউল-সম্প্রদায় প্রচলিত সব আনুষ্ঠানিক ধর্মকেই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রচলিত ধর্মের তাত্ত্বিক বা দার্শনিক ধারণাকে অনেকক্ষেত্রে গ্রহণ করলেও তার আচরিক দিক সম্পর্কে কখনোই আগ্রহ পোষণ করেন নি। তাঁরা কোরান-পুরাণ, বেদ-বাইবেল কোনো ধর্মগ্রন্থকেই মান্য করেননি। সনাতন শাস্ত্র-আচার ও প্রচলিত সমাজ-ধর্মের বিরুদ্ধেই তাঁদের বিদ্রোহ। সম্প্রদায়ধর্মের সংকীর্ণ প্রাচীর ভেঙে তাঁরা পেয়েছেন এক উদার মিলন-ময়দানের সন্ধান। ভজনালয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়না বলেই তাঁদের বিশ্বাস। ঈশ্বর, সেই পরমপুরুষ, হলেন 'মনের মানুষ', মনের মধ্যেই তাঁকে অন্বেষণ করতে হয়। উপাসনালয়ই সকল মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছে:

তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই, চলতে না পাই—
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশিদে ॥

তাই সহজেই তাঁরা বলতে পারেন:

বীণার নামাজ তারে তারে
আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।

বাউলের সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিপক্ষে। অখণ্ড মানবধর্মের পক্ষেই চিরকাল তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে তাঁরা কখনোই প্রশ্রয় দেননি। জাতবিচারের সংকীর্ণতাকে তাঁরা ঘৃণা

করেছেন। জাত-ধর্মের গণ্ডির বাইরে তাঁরা নিজেদের 'ব্রাত্য' 'মন্ত্রহীন' বলে পরিচয় দিয়েছেন। বৈষ্ণব সহজিয়ার মতো বাউলও মর্মহীন ধর্মকথাকে অনুমোদন করেনি। পরম প্রত্যাশিত 'মনের মানুষ'কে পাওয়ার জন্য প্রয়োজন শুদ্ধ ভক্তির। ভক্তের কোনো জাত নেই। লালন তাঁর একটি গানে বলেছেন :

ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে
তার জাতের বিচার নাই॥

লালনের গানে বারবার ছুঁৎমার্গ আর জাতবিচারের অসারতা প্রকাশিত হয়েছে। এ-বিষয়ে সাধক লালন তাঁর মনোভাব প্রকাশ করে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন :

জাত না গেলে পাইনে হরি
কি ছার জাতের গৌরব করি
ছুঁসনে বলিয়ে।
লালন কয় জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে॥

অস্পৃশ্যতা আর ছুঁৎমার্গের প্রতি বীতশ্রদ্ধ লালন অনেকটা চ্যালেঞ্জের সুরেই বলেছেন :

একবার জগন্নাথে দেখ্‌রে যেয়ে জাত কেমন রাখ বাঁচিয়ে।
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে তাই খায় চেয়ে॥

বাউলের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ধর্মের কোনো যোগ নেই। লালন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ভেতর দিয়ে জেনেছিলেন জাত-ধর্মের অসারতা তাই তিনি তাঁর জাত-ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে যে জবাব দিয়েছিলেন তাতে সম্প্রদায়ধর্মের অযৌক্তিকতা ও অসারতার কথা ঘোষিত হয়েছে :

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে॥

যুক্তি দিয়ে লালন বলেছেন :

গর্তে গেলে কূপজল হয়
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়
মূলে একজল, সে যে ভিন্ন নয়।
ভিন্ন জানায় পাত্র-অনুসারে।

সে কারণেই :

জগৎ-বেড়ে জেতের কথা
লোকে গৌরব করে যথা-তথা
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাধ-বাজারে ॥

লালনএই জাত-ধর্মের খোলস দূরে সরিয়ে রেখেই সাধক-দলে নাম লিখিয়েছিলেন।

লালন বাউলমতবাদে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি পালন করতেন বাউলের ধর্ম। তিনি কখনোই কোনো বিশেষ ধর্মের শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলেননি। বরঞ্চ বাউলসাধনা করতে গিয়ে অনেক সময়ই তাঁর মনে শাস্ত্র-ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন ও সংশয় জেগেছে এবং তাঁর গানে এমন অনেক বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছে যা অনিবার্যভাবে শাস্ত্রবিরোধী। যেমন আসমানী কেতাব লালনের অভিমত :

কি কালাম পাঠাইলেন আমার সাঁই দয়াময়।
এক এক দেশে এক এক বাণী কয় খোদা পাঠায় ॥...
যদি একই খোদার হয় বর্ণনা
তাতে তো ভিন্ন থাকে না
মানুষের সকল রচনা
তাই তো ভিন্ন হয় ॥
এক এক দেশে এক এক বাণী
পাঠান কি সাঁই গুণমণি
মানুষের রচনা জানি
লালন ফকির কয় ॥

আবার তাঁর গানে পুনরুত্থান-দিবস সম্পর্কে জেগেছে সংশয়:

রোজ-কেয়ামত বলে সবাই
কেউ বলে না তারিখ নির্ণয়
হিসাব হবে কি হচ্ছেরে সদায়
কোন্ কথায় মন রাখি রাজি ।।

মেয়ারাজ সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ নন তিনি:

মেয়ারাজের কথা শুধাবো কারে।
আদম তন আর নিরূপ খোদা
নিরাকারে মিললো কি করে ।।

নামাজ সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য শরিয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর:

পড়গে নামাজ জেনে শুনে।
নিয়েত বাঁধগে মানুষ-মক্কা পানে ।।

কিংবা,

সেজদা হারাম খোদা ছাড়া
মুর্শিদ বর্জখ সামনে খাড়া
সেজদার সময় থুই কোথায় ।।

'যেহি মুরশিদ সেহি খোদা', 'আল্লা নবী দুটি অবতার' অথবা 'রসুলকে চিনিলে খোদা চেনা যায়। / রূপ ভাঁড়িয়ে দেশ বেড়িয়ে গেলেন সেই দয়াময়' ইত্যাদি বক্তব্যের উপস্থাপন ও ব্যাখ্যার মধ্যে শাস্ত্র-নিরপেক্ষ বাউল সাধনার নিগূঢ় পরিচয় ও রহস্য নিহিত আছে।

বাউলসাধনায় 'মানুষতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ-সম্পর্কে জানা যায়:

মানব-দেহস্থিত পরমতত্ত্ব বা আত্মাকে বাউল 'মনের মানুষ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।...এই মানুষ অলক্ষ্য অবস্থায় হৃদয়ে বা মনে অবস্থান করিতেছেন, বোধহয়, এই কল্পনা করিয়া তাহারা তাঁহাকে 'মনের মানুষ' বলিয়াছে। এই আত্মাকে তাহারা 'মানুষ', 'মনের মানুষ', 'সহজ মানুষ', 'অধর মানুষ', 'রসের মানুষ', 'ভাবের মানুষ', 'আলেখ মানুষ' 'সোনার মানুষ', 'সাঁই' প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়াছে।[৬১]

'আরশিনগরের পড়শী' যিনি তিনিই লালনের 'মনের মানুষ', তিনিই 'অলখ সাঁই', 'সাঁই নিরঞ্জন'। এই 'মানুষে'র অন্বেষণেই বাউলের সাধনা নিয়োজিত। 'মানুষতত্ত্ব ভজনের সার' এই হলো তাঁর মূল কথা। লালন বলেন:

মানুষ-তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে॥
মাটির টিপি, কাঠের ছবি
ভুত ভাবে সব দেবাদেবী
ভোলেনা সে এসব রূপি
ও যে মানুষ-রতন চেনে॥
জিন-ফেরেস্তার খেলা
পেঁচোপেঁচি আলাভোলা
তার নয়ন হয়না ভোলা
ও সে মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে॥

এই 'মানুষ'কে খুঁজে পাওয়া সহজকর্ম নয়। যদিও 'এই মানুষে সেই মানুষ আছে', তবু 'কত মুনি-ঋষি চার যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে'।

জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়।
ধরতে গেলে হাতে কে পায়
তেমনি সে থাকে সদায়
আলেকে বসে॥

'আত্মতত্ত্ব' না জেনে ভ্রান্ত হয়ে তাঁকে বাইরে খুঁজে কোনো ফল হবেনা। তাঁকে শরিয়তের আনুষ্ঠানিকতায় পাওয়া যাবে না, মারেফতের অবলম্বন ব্যতীত:

এক অজান মানুষ ফিরছে দেশে তারে চিনতে হয়।
তারে চিনতে হয়, তারে মানতে হয়॥
শরিয়তের বুনিয়াদে
পাবে না তা কোনোমতে
জানা যাবে মারেফতে
যদি মনের বিকার যায়॥

মনের মানুষের সন্ধান, সাহচর্য ও মিলনের জন্য বাউলের মন সর্বদা ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত। কিন্তু 'হীন হয়েছি সাধনগুণে' তাই পেয়েও পাওয়া যায় না তাঁকে। লালনের ব্যাকুল প্রতীক্ষা আফসোসের হাহাকারে উচ্চারিত:

আমার মনের মানুষের সনে
মিলন হবে কতদিনে।।

কিন্তু সাধন-সিদ্ধি হয়না বলে,

সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁকরে।।

'এই মানুষে হবে মাধুর্য-ভজন', তাই 'মানুষ-রূপ গঠলো নিরঞ্জন'। সেইজন্য এই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনের মূল্য অপরিসীম। লালনের গানে মানব-মহিমা ও মানব-বন্দনার এক অনবদ্য প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়:

এমন মানব জনম আর কি হবে।
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।।
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই
দেব-দেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।।
কত ভাগ্যের ফলে না জানি
মনরে পেয়েছে এই মানব-তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়
যেন ভরা না ডোবে।।

বাউলের কোনো শাস্ত্র গ্রন্থ নেই। গানেই এই সম্প্রদায়ের সাধন-ভজন আচার-দর্শনের পরিচয় নিহিত। আর লালন তাঁর গানে বাউলসাধনার শ্রেষ্ঠ ভাষ্য রচনা করেছেন। লালন নিজেও বাউলসাধনার উচ্চস্তরে পৌঁছে-ছিলেন। 'হিতকরী' পত্রিকা-সূত্রে (পূর্বোক্ত) জানা যায়, লালন "ধর্ম্মজীবনে বিলক্ষণ উন্নত ছিলেন"। পত্রিকা আরো জানাচ্ছে:

নিজে লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই

পড়েন নাই; কিন্তু ধর্ম্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্ম্ম-সাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিলনা।...যাহা হউক তিনি একজন পরম ধার্ম্মিক ও সাধু ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই।

লালন ফকির তাঁর ব্যক্তিগত সাধনা, চর্চা, অনুশীলন ও উপলব্ধির দ্বারা বাউলসাধনাকে সর্বোচ্চ বিকাশের পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে ছিলেন। একথা আজ স্বীকৃত যে, লালন শাহ বাউলমত ও সাধনার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার এবং তিনিই এই মরমীসাধনার প্রধান পুরুষ।

লালনের গানের শিল্পমূল্য

বাউলগান বাঙলার একটি প্রধান লৌকিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীত। তাঁদের অধ্যাত্ম-সাধনার গূঢ়-গুহ্য পদ্ধতি কেবল দীক্ষিত শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই গানের আত্মপ্রকাশ। শিল্প-সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস এখানে অনুপস্থিত। লালনও তাই বিশুদ্ধ শিল্প-প্রেরণায় তাঁর গান রচনা করেননি, বিশেষ উদ্দেশ্য সংলগ্ন হয়েই তাঁর গানের জন্ম। তবে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনকে অতিক্রম করে লালনের গান অনায়াসে শিল্পের সাজানো বাগানে প্রবেশ করেছে স্বমহিমায়। লালনের গান তাই একাধারে সাধনসঙ্গীত, দর্শনকথা ও শিল্পশোভিত কাব্যবাণী। তত্ত্বসাহিত্যের ধারায় চর্যাগীতিকা বা বৈষ্ণবপদাবলী সাধনসঙ্গীত হয়েও যেমন উচ্চাঙ্গের শিল্প সাহিত্যের নিদর্শন, তেমনি বাউলগানের শ্রেষ্ঠ নজির লালনের গান সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযুক্ত।

দীর্ঘজীবী লালন প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরে গান রচনা করেছেন। তাঁর গানের সঠিক সংখ্যা কতো তা নির্ণয় করা না গেলেও কেউ কেউ অনুমান করেন তা অনায়াসেই হাজারের কোঠা ছাড়িয়ে যাবে। লালন ছিলেন নিরক্ষর, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁর হয়নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতের বাণীর সৌকর্য, সুরের বিস্তার, ভাবের গভীরতা আর শিল্পের নৈপুণ্য লক্ষ্য করে তাঁকে শিক্ষা-বঞ্চিত নিরক্ষর সাধক বলে মানতে দ্বিধা থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে লালন ছিলেন স্বশিক্ষিত;—'দীর্ঘ শতবর্ষ ধরে ইনি জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন।[৬২] ভাবের সীমাবদ্ধতা,

বিষয়ের পৌনঃপুনিকতা, উপমারূপক-চিত্রকল্পের বৈচিত্র্যহীনতা ও সুরের গতানুগতিকতা থেকে লালন ফকির বাউলগানকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর সমকালেই তাঁর গান লৌকিক ভক্তমণ্ডলির গণ্ডি অতিক্রম করে শিক্ষিত সুধীসমাজকেও গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। উত্তরকালে লালনের গান দেশের ভূগোল অতিক্রম করে বিদেশেও স্থান করে নিয়েছে। তাঁর গান উচ্চ শিল্পমানের পরিচায়ক বলেই এই অসামান্য সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। লালনের গান আজ সঙ্গীত-সাহিত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত।

বাউলগানের রসজ্ঞ বোদ্ধা রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১) প্রসঙ্গক্রমে একবার বলেছিলেন:

> অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চ'লে গেছে তা চলতি হাটের শস্তা দামের জিনিয হ'য়ে পথে পথে বিকোচেচ। অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা তুলনার দ্বারা আকীর্ণ,—তার অনেকগুলোই মৃত্যুভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগী টানবার প্রচারকগিরি। এর উপায় নেই, খাঁটি জিনিষের পরিমাণ বেশি হওয়া অসম্ভব, খাঁটির জন্যে অপেক্ষা করতেও তাকে গভীর ক'রে চিনতে যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন তা সংসারে বিরল। এইজন্য কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চলতে থাকে। এইজন্য সাধারণতঃ যে-সব বাউলের গান যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়, কি সাধনার কি সাহিত্যের দিক থেকে তার দাম বেশী নয়।[৬৩]

সাধারণ বাউলগানের এই যে বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে লালনের গানের তুলনা করলেই লালনগীতির স্বাতন্ত্র্য ও উৎকর্ষতা অনায়াসে ধরা পড়বে। লালনের মতো একজন নিরক্ষর গ্রাম্য সাধক কবির শিল্প-ভুবনে প্রবেশ করলে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

লালনের গানে শিল্পের প্রসাধন কিভাবে সেই গানের লালিত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করেছে এখানে আমরা তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করবো।

কেবল সংখ্যায় নয় শিল্পগুণেও লালনের গান বাউলসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ভাব-ভাষা. ছন্দ-অলঙ্কারবিচারে এই গান উচ্চ শিল্পমানের পরিচায়ক— এবং তা তর্কাতীতরূপে কাব্যগীতিতে উত্তীর্ণ।

শব্দের জিয়ন-কাঠিই কবিতা কিংবা গানের শরীরে প্রাণ প্রবাহ সঞ্চার করে থাকে। কুশলী শিল্পীর হাতে প্রচলিত শব্দ নতুন ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য নিয়ে ধরা দেয়। প্রয়োগ-নৈপুণ্যে আটপৌরে শব্দও যে কীভাবে নতুন অর্থ-ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে লালনের গানে তার উজ্জ্বল উদাহরণ বিদ্যমান। লালন ছিলেন শব্দ-কুশলী ও শব্দ-সচেতন শিল্পী। 'বাড়ির কাছে আরশিনগর সেথা এক পড়শী বসত করে' লালনের একটি প্রাতিস্বিক গান। এখানে পরম আকাঙ্ক্ষিত অচিন এক পড়শীর সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতা প্রকাশিত। সেই অধর মানুষের পরশ-লাভ করলে লালনের ভব-বন্ধন-জ্বালা যেতো ঘুচে। কিন্তু 'সে আর লালন একখানে রয়, / তবু লক্ষ যোজন ফাকরে'। এখানে 'যোজন' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়। দূরত্ব-নির্দেশক 'যোজন' শব্দটি এখানে যেভাবে সুপ্রযুক্ত, দূরত্ব জ্ঞাপক আর অন্য কোনো শব্দই এর যোগ্য বিকল্প হতে পারে না। 'যোজনে'র পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ এখানে ব্যবহৃত হলে শুধু এই পংক্তিটিই নয় সম্পূর্ণ গানটিরই শিল্প-আঁটুনি শিথিল হয়ে যেতো।

'কে কথা কয়রে দেখা দেয়না'—লালনের এই গানটিতেও নিকটে অবস্থিত অথচ স্পর্শ ও দর্শনের অতিত এক সত্তার অন্বেষণে সাধকের ব্যাকুলতা প্রকাশিত। এই গানেরই একটি পংক্তি—'ক্ষিতি জল কি বায় হুতাশন'। এই পংক্তির ভিন্নরকম বিন্যাস কিংবা বিকল্প শব্দের প্রয়োগ অচিন্তনীয়।

শব্দের শুদ্ধরূপের বিচ্যুতি বা তার আঞ্চলিক রূপের প্রয়োগও যে লালনের গানে কতো সুন্দর মানিয়ে যায় তার দৃষ্টান্ত প্রচুর। যেমন, 'গাহেক' (গ্রাহক)—'খুলবে কেন সে ধন ও তার গাহেক বিনে', কিংবা 'গেরাম' (গ্রাম)—'গেরাম বেড়ে অগাধ পানি'। আবার 'পাগলা খিজি', 'কোণা-কানছি', 'গোড়ানি', 'সেই হবা', 'কপনি ধজা' ইত্যাদি। তাঁর এই শব্দ-প্রয়োগের নৈপুণ্য সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাই

> সহজ সরল বাংলা শব্দের মধ্যে কত যে রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে তাঁর গানের শব্দপ্রয়োগও অনায়াস বয়নকুশলতাই সে সাক্ষ্য বহন করছে। এমন ঝরঝরে নির্ভার তদ্ভব শব্দ প্রয়োগের কারুকলা আর কোনো লোককবির গানে দেখা যায়না। লালন

তাঁর সমসাময়িক এবং পূর্ব ও পরবর্তীকালের অন্যান্য লোককবি থেকে এখানেই বিশিষ্টতার দাবী করেন। সেইজন্য লালন শ্রেষ্ঠ বাউল ও লোককবি।[৬৪]

আবার তাঁর তৎসম শব্দের যথোপযুক্ত ব্যবহার বিস্ময়ের সৃষ্টি করে এবং এই নিরক্ষর গ্রাম্য সাধককবির প্রতি পাঠক-শ্রোতাদের শ্রদ্ধা ও মনোযোগ বাড়িয়ে দেয়। যেমন—বাঞ্ছা, স্বয়ম্ভু, ভাস্কর, নিরঞ্জন, স্কন্ধ, লক্ষ, অন্তিম-কাল, অমর্ত্য, নিষ্ঠা, মৈথুন, ত্বরা, অনন্ত, ভুজঙ্গনা, মীন, ব্রহ্মাণ্ড নপুংসক, জ্যোতির্ময়, বিভূতি, ধূপ, দর্পণ, ত্রিভুবন, সৌদামিনী, চিদানন্দ, শরণ, কিঞ্চিৎ, দিব্য, নির্বিকার, অন্বেষণ। এই উদাহরণ অনায়াসে আরো দীর্ঘ হতে পারে। লালন তাঁর গানে সমার্থক একাধিক শব্দ (আরশি, আয়না, দর্পণ) ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন; যেমন—ক. 'বাড়ির কাছে আরশিনগর', খ. 'আয়নামহল তায়', গ. 'জানো না মন পারাহীন দর্পণ'।

আরবি-ফারসি শব্দের সুষম ব্যবহার লালনের গানকে আরো আকর্ষণীয় ও শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করেছে। কয়েকটি প্রয়োগ-উদাহরণ লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে বাঙলা শব্দের সঙ্গে তিনি এইসব শব্দের কী গভীর আত্মীয়তা-যোগ ঘটিয়েছেন এ-সব ক্ষেত্রে। আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার যে কতো প্রাসঙ্গিক, অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে তার উদাহরণ লালনের এই গানটি :

বাকির কাগজ মন তোর গেল হুজুরে।
কোন্‌দিন তোর আসবে শমন সাধের অন্তঃপুরে ॥

যেদিন ভিঁটায় হয় বসতি
দিয়েছিলে মন খোস্‌কবলতি
তুমি হরদম নাম রাখবে স্থিতি
এখন ভুলে গিয়েছ তারে ॥

আইন-মাফিক নিরিখ-দেনা
ও মন, তাতে কেন তোর ইতরপনা
যাবেরে মন যাবে জানা
জানা যাবে আখেরে ॥

সুখ পা'লে হও সুখ-ভোলা
দুখ পা'লে হও দুখ-উতলা
লালন কয় সাধনের বেলা
মন তোর কিসে জুৎ ধরে ॥

অন্যত্র পাওয়া যায়:

ক. গঠেছে সাঁই মানুষ-মক্কা কুদরতি নূর দিয়ে
খ. এলাহি আলামিন গো আল্লা বাদশা আলামপনা তুমি
গ. সেই মোয়াহেদ দায়মাল হবে
ঘ. কুল্লে শাইইন মুহিত খোদা
ঙ. ফেরেবি ফকিরি দাড়া, দরগা নিশান ঝাণ্ডা গাড়া।

লালনের গানে আরবি-ফারসি শব্দ-ব্যবহার প্রসঙ্গে আবু জাফর (জ. ১৯৪২) যে-মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য:

> ...আরবি-ফারসি শব্দ ও বাক্যবন্ধের সফল প্রয়োগের যে কৃতিত্ব আমরা নজরুল ইসলামে আরোপ করে থাকি, সেই কৃতিত্ব আরো আগে আরো অনিবার্যভাবে লালনের প্রাপ্য।[৬৫]

লালন তাঁর গানে ইংরেজি শব্দও কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন; যেমন—গড, কোর্ট, জুরী, বেরাদর (ব্রাদার) ম্যাজিষ্টারী (ম্যাজিষ্ট্রেট), পক্কো (পক্স) ইত্যাদি। এর থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে নিরক্ষর লালনের শব্দ ভাণ্ডার কতো সমৃদ্ধ ছিলো। আশরাফ সিদ্দিকী (জ. ১৯২৭) লালনগীতির শব্দ-মটিফিম সম্পর্কিত আলোচনায় লালনেল শব্দ-ব্যবহারের বিশেষ ও তাৎপর্যের আভাস দিয়েছেন।[৬৬]

এই স্ব-শিক্ষিত বাউলকবির শব্দ-ভাণ্ডার এবং তাঁর শব্দ-নির্বাচন ও প্রয়োগের নৈপুণ্য ও সচেতনতা লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয়। এ-বিষয়ে আবু জাফরের সতর্ক বীক্ষণে উদ্ঘাটিত হয়েছে:

> ...শব্দ ব্যবহারে লালন যে অস্বাভাবিকরূপে দক্ষ ছিলেন, তাঁর ব্যবহৃত সব শব্দই যে বিপুল পরিমাণে ভাবগর্ভ ও বিদ্যুৎবাহী; এ বিষয়ে সকলে একমত হবেন। সবাই মেনে নেবেন লালনের অসংখ্য গানের মধ্যে এমন একটি শব্দও খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য যা যথাযথ এবং সুপ্রযুক্ত নয়, এমন একটি চরণও অনুপস্থিত যার বিন্যাস কোন প্রশ্ন

উত্থাপন করে। আর শুধু শব্দের বিন্যাস নয়,আধুনিক নিয়মে অসংখ্য শব্দ এই লালনের স্পর্শেই নতুনভাবে অর্থ পেলো, সঙ্কোচন প্রসারণে পেলো নতুন আয়তন, কখনো কখনো নতুনভাবে নির্মিতও হলো শব্দ।[৬৭]

উপর্যুক্ত বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচক যথার্থই সিদ্ধান্ত করেছেন যে :

কবিতা প্রসঙ্গে একটি সুপরিচিত সংজ্ঞা 'Best words in the best order', উৎকৃষ্টতম শব্দের সুন্দরতম বিন্যাসই কবিতা—লালনগীতির প্রতিটি চরণ এই পরিচয়ে নিবিড়।[৬৮]

বাউলগানের রসগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের ছন্দ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করে এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি লালনের 'আছে যার মনের মানুষ আপন মনে / সে কি জপে মালা' এবং 'এমন মানব-জনম আর কি হবে'—এই গান দুটি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেন :

এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেয়ে নয়। ছোটো-বড়ো নানা-ভাগে ঝাঁকে ঝাঁকে চলেছে। সাধুপ্রসাধনে মেজে-ঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশাকরি বলবার সাহস হবেনা কারো।[৬৯]

রবীন্দ্রনাথ দৃঢ় প্রত্যয়ে অভিমত পোষণ করেছেন যে, "এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব"।[৭০] এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র 'বাঙালির দিবারাত্রির ভাষা'য় রচিত লালনের একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন, "প্রাকৃত-বাংলাকে গুরুচণ্ডালি স্পর্শই করেনা। সাধুছাঁদের ভাষাতেই শব্দের মিশোল সয়না।"[৭১]

ছন্দের শাসন লালনের গানকে একটি নিটোল শিল্পে পরিণত করেছে। তাঁর ছন্দবোধ অনুশীলনের ফসল নয়, বরঞ্চ তা তাঁর স্বভাবেরই অন্তর্গত শিল্প-ধারণা থেকে উৎসারিত। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত—বাঙলা ছন্দের এই ত্রিবিধ মাধ্যমেই তাঁর সার্থক পরিক্রমণ লক্ষ্য করা যায়।[৭২]

অলঙ্কার-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও লালনের নৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। উপমা-রূপক-চিত্রকল্প-উৎপেক্ষা লালনগীতিকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। উপমা ও চিত্রকল্পের যুগল ব্যবহার লালনের গানকে কেমন দীপ্তিময় করে তুলেছে এখানে তার উদাহরণ পেশ করা হলো :

মাকাল ফলের বরণ দেখে
যেমন ডাসে এসে নাচে কাকে

তেমনি আমার মন, চটকে বিমন
সার পদার্থ নাহি চেনে।।

কিংবা,

মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন
লুকালে না পায় অন্বেষণ
কালারে হারায়ে তেমন
ও রূপ হেরিয়ে স্বপনে।।

আবার,

এক নিরিখে দেখ ধনি, সূর্যগত কমলিনী
দিনে বিকশিত কমলিনী, নিশিথে মুদিত রহে।
তেমনি জেন ভক্ত যেজন, এক রূপে বাঁধে হিয়ে।।

বাউলগান রূপকাশ্রিত, তাই লালনের গানে অনিবার্যভাবে রূপকের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন নীচের এই গানটি :

লাগল ধুম প্রেমের থানাতে
মন-চোরা পড়েছে ধরা রসিকের হাতে।
ও সে ধরেছে চোরকে হাওয়ায় ফাঁদ পেতে।।
ভক্তি-জমাদারের হাতে
দু'দিন চোর জিম্মা থাকে
তিনদিনের দিন দেয় সে চালান
আষ্টেপিষ্টে বেঁধে।।

অন্যত্র পাওয়া যায় : 'কুলের বউ', 'মনের লেংটি', 'মানের-তরণী', মন-কাশ', 'পাপ-সাগর, 'মানুষ-মক্কা', 'আরশিনগর', 'প্রেম-ফাঁদ', 'ভব-কারাগার', 'দয়ালচাঁদ', আবহায়াত-নদী' ইত্যাদি।

প্রচলিত ইঙ্গিতধর্মী প্রবাদ-প্রবচন-সুভাষণের ব্যবহার তাঁর কাব্যগীতিতে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিক ভিত্তি-অর্জনের জন্য এই প্রয়োগ বিশেষ সহায়ক হয়েছে। লালনগীতিতে ব্যবহৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবাদ-প্রবচন-সুভাষণ :

ক. কাক মারিতে কামান-পাতা
খ. সুঁই-ছিদ্রে চালায় হাতী

গ. পিঁড়েয় বলে পেঁড়োর খবর
ঘ. গুড় বললে কি মুখ মিঠে হয়
ঙ. দীপ না জ্বাললে কি আঁধার যায়
চ. মারে মৎস্য না ছোঁয় পানি
ছ. ঠাকুর গড়তে বাঁদর হলোরে
জ. যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায় খেলোরে
ঝ. হাওয়ার চিড়ে কথার দধি ফলার হচ্ছে নিরবধি
ঞ. হাতের কাছে হয়না খবর, কি দেখতে যাও দিল্লী-লাহোর।

অনুপ্রাসের ব্যবহার লালনের গানকে বিশেষ ধ্বনি-ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছে। যেমন:

ক. গুরু, তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী
গুরু, তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী
গুরু, তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী
না বাজাও বাজবে কেনে ॥
খ. যার যেখানে ব্যথা নেহাত, সেইখানে হাত ডলামলা।
গ. ধররে অধরচাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে।
ঘ. কারুণ্য তারুণ্য এসে লাবণ্যে যখন মিশে।
ঙ. আঁখির কোণে পাখির বাসা।

লালনের অতুলনীয় কবিত্ব-শক্তির পরিচয় তাঁর অনেক গানেই বিধৃত। বিশেষ করে তাঁর 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়', 'বাড়ির কাছে আরশিনগর', 'কোথা আছেরে দীন দরদী সাঁই', 'এ-দেশেতে এই সুখ হলো', 'কে কথা কয়রে দেখা দেয়না, 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে', 'পাখি কখন উড়ে যায়', 'আমার আপন খবর আপনার হয়না', 'আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে', 'এমন মানব-জনম আর কি হবে', 'মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষেরি সনে', 'আর কি বসবো এমন সাধুর বাজারে', 'গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার লওগো সুপথে', 'কবে সাধুর চরণধূলি লাগবে মোর গায়', 'এলাহি আলামিন আল্লা বাদশা আলমপনা তুমি', 'তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাব না', 'ঘরে কি হয় না ফকিরি', 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে', 'পার কর হে দয়ালচাঁদ

আমারে' প্রভৃতি শিল্পসৌকর্যমণ্ডিত গান আজ বাঙলাসাহিত্যের পরম মূল্যবান সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহীত।

বহুল উচ্চারিত তত্ত্বকথা ও সীমাবদ্ধ বিষয়ের অনুবর্তন সত্ত্বেও লালন তাঁর সঙ্গীতে সেই গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে নতুন ভাব-ব্যঞ্জনার স্বষ্টি করেছেন। তত্ত্বকথার দুরূহ ও ক্লান্তিকর বদ্ধ আবহে এনেছেন শিল্প-সৌন্দর্যের সুবাতাস। তাই বাঙলার মরমী কবিদের মধ্যেই যে কেবল তিনি শ্রেষ্ঠ তাই নয়, বাঙলার সঙ্গীতসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি এক কালোত্তীর্ণ স্মরণীয় শিল্পী-ব্যক্তিত্ব।

লালনের শৈল্পিক কৃতিত্ব, উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তি ও বাঙলাকাব্যে তাঁর স্থান সম্পর্কে সুধী-সমালোচকবৃন্দ যে বক্তব্য-মন্তব্য পেশ করেছেন তা লালনের শিল্পী-সত্তার মূল্যায়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। আমরা এখানে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক অভিমত উদ্ধার করে দিলাম।

কাজী মোতাহার হোসেন মন্তব্য করেছেন:

> সঙ্গীতপ্রিয় বাংলা-দেশীয় সমাজে লোকগীতির ক্ষেত্রে সাধক লালন শাহ এত অজস্র ও অনবদ্য অবদান রেখে গেছেন যে, এইসব পরমার্থ-সূচক মরমী গানের সহজ প্রকাশমাধুর্য ও লালিত্যের গুণেই তিনি বেশ কয়েক শতাব্দী যাবত বাঙালীর হৃদয়ে ভাব-লহরীর উদ্রেক করতে পারবেন।[৭৩]

অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন:

> তিনি স্বভাব-কবি। মুখে মুখে গান বানিয়ে তখনি তখনি শোনাতেন। শোধনের অবকাশ পেতেন না। ছন্দ মিল নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তা সত্ত্বেও যা হতো তা সাধনার দিক থেকে উচ্চ-কোটির। কবিতা হিসাবেও উচ্চাঙ্গের। সংগীত হিসাবে তো অপূর্ব।[৭৪]

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালনের গান বিশ্লেষণ করে অভিমত পেশ করেছেন যে:

> সবদিক দিয়া বিবেচনা করিলে বাউলগান রচয়িতা হিসাবে মুসলমান বাউল লালন ফকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। মূল-তত্ত্বজ্ঞতা, সাধনের দীর্ঘ

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, প্রত্যয় ও দিব্যদৃষ্টি, বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সূফীতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, বক্তব্য ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাময় করিয়া বলিবার কৌশল, সহজ কবিত্ব-শক্তি প্রভৃতিতে তাঁহার গানগুলি বাংলা-সাহিত্যের একটি সম্পদ। গানগুলির মধ্যে রচয়িতার সংগীত-জ্ঞানেরও যথেষ্ট নিদর্শন আছে। সুরের সহিত গানগুলির ছন্দ ও মিলের সুন্দর সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। গানগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র,—এক-একটি ভাব যেন ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুর-সংযোগে অভিব্যক্ত তাঁহার গানের অকৃত্রিম আবেগের মধ্যে একটা অনির্বচনীয়ত্বের বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়া আমাদের চিত্তকে অপূর্ব ভাবলোকে যেন উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।[৭৫]

আহমদ শরীফ লালনের গানের দার্শনিক ও সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারণ করে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য :

ভেদবুদ্ধিহীন মানবতার উদার পরিসরে সাম্য ও প্রেমের সুউচচ মিনারে বসেই লালন সাধনা করেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক ও দার্শনিকদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি সাম্য ও প্রেমের বাণী শুনিয়েছেন। তিনি রুমী, জামী ও হাফেজের সগোত্র এবং কবীর, দাদূ ও রজবের উত্তরসাধক। লালন কবি, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা ও প্রেমিক। তাঁর গান লোকসাহিত্য মাত্র নয়, বাঙালীর প্রাণের কথা, মনীষার ফসল ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর।[৭৬]

মূলত লালনের গানের অসামান্য শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য, উচচাঙ্গের দর্শন ও প্রবল মানবিকতাবোধের জন্যই বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-মনীষা রবীন্দ্রনাথ থেকে অন্নদাশঙ্কর রায় এবং বিদেশে ধীমান সাহিত্য-সমালোচক Edward C. Dimock থেকে Charles Capwell লালনের গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

বাউলগানের রসজ্ঞ মরমী বোদ্ধা রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক কবিতায় বলেছিলেন :

সাহিত্যের ঐকতানসংগীতসভায়
একতারা যাঁহাদের তাঁরাও সম্মান যেন পায়—
[ঐকতান : জন্মদিনে]

—তাঁর এই আন্তরিক প্রত্যাশা বাঙলাসাহিত্যের দরবারে লালন ফকিরের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্থকভাবে পূরণ হয়েছে।

লালন শাহ ঃ সমাজচেতনার স্বরূপ

পলাশীর যুদ্ধের সতেরো বছর পর বাঙলার এক ক্রান্তিকালে লালনের জন্ম। এর মাত্র নয় বছর আগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেছে। লালনের দীর্ঘজীবন ইংরেজ শাসনের গুরুত্বপূর্ণ সময়কে স্পর্শ করেছে। এই সময়কালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, জন্ম হয়েছে নতুন সামন্ত শ্রেণীর। এঁরাই ছিলেন 'বাবু কালচারে'র জনক ও পৃষ্ঠপোষক। ইংরেজের গরজে—আনুকূল্যে গড়ে ওঠা কলিকাতা মহানগরীকে কেন্দ্র করে এক শিক্ষিত বাঙালী মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। লালনের কালে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ওহাবী-ফারায়জী আন্দোলন, তীতুমীরের সংগ্রাম, সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহে। হিন্দুমেলা, জাতীয় কংগ্রেস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে জাতীয় জাগরণের উন্মেষ ঘটেছে এই সময়ে। শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলিকাতা মাদ্রাসা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, হিন্দু কলেজ, কলিকাতা মেডি-ক্যাল কলেজ, বেথুন কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ। রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা এবং রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রচেষ্টার কাজও শুরু হয়েছে এইসময়ে। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়েছে সুবাতাস। এইসময়ে বাঙালীর শিক্ষা-রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য-ধর্মজীবনে এসেছেন রামমোহন, রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭), ডিরোজিও (১৮০৯—১৮৩১), দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫), বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭৩), রামকৃষ্ণ পমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬), কেশবচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৮৪) বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮—১৮৯৪)। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর নানা কর্মকাণ্ডে বাঙালীর জীবন স্পন্দিত। তবে একথা মনে রাখার প্রয়োজন আছে যে, বাঙালী জীবনের এই জাগরণ কলিকাতাকেন্দ্রিক এবং তা মূলত এই মহানগরীর ভেতরেই

ছিলো সীমাবদ্ধ। এর সুফল সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়তে ঢের সময় লেগেছিল।

লালন ছিলেন গ্রামের মানুষ। তার ওপরে গুহ্য সাধন-ক্রিয়া-কাণ্ডে বিশ্বাসী নিরক্ষর বাউল। তাই নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালীর এইসব কর্মকাণ্ডের খবর বা এর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ও প্রয়োজন তাঁর ছিলোনা বললেই চলে। এসব ব্যাপারে আলোড়িত হওয়ার মতো শিক্ষা ও সাধনাও তাঁর ছিলোনা। তবুও তিনি গ্রামীণ জীবনে তাঁর সাধনা ও উপলব্ধির মাধ্যমে জাগরণের যে তরঙ্গ তুলেছিলেন তা বিস্ময়কর ও অসাধারণ। তাঁর এই অবদানকে কেউ কেউ রামমোহনের ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছেন।

রামমোহনের উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্ম-সমন্বয়ের শুভ-চেষ্টা বহুল কীর্তিত বিষয় এবং তিনি 'ভারতপথিক' ও বাঙলার নবজাগৃতির 'ঋত্বিক' হিসেবে সম্মানিত। কিন্তু অখ্যাত পল্লীর অধিবাসী নিরক্ষর লালনের সমাজচিন্তা, মানবপ্রেম ও মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় আজও উপেক্ষিত ও অলিখিত। দু-একজন কেবল এ-বিষয়টি মৃদুভাবে স্পর্শ করেছেন মাত্র। অন্নদাশঙ্কর রায় উল্লেখ করেছেন:

> বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের যে গুরুত্ব বাংলার লোক-মানসের দেয়ালী উৎসবে লালনেরও সেই গুরুত্ব। দুই যমজ সন্তানের মতো তাঁদের দু'জনের জন্ম। দু'বছর আগে পরে। ইতিহাস-জননীর পক্ষে দুই বছর যেন দুই মিনিট। তবে একসঙ্গে এলেও তাঁরা একসঙ্গে যাননি। লালনের পরমায়ু যেন রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের জোড়া পরমায়ু। লোকসংস্কৃতিতে একক ব্যক্তিত্বের এমন বিরাট উপস্থিতি আমাদের অভিভূত করে।[৭৭]

অধ্যাপক অমলেন্দু দে লোকায়তজীবনে লালনের প্রভাব এবং লালন ও রামমোহনের ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনার গুরুত্ব স্বীকার করে বলেছেন:

> বাংলাদেশে রামমোহনের সমসাময়িক ছিলেন মরমী কবি লালন শাহ (১৭৭৪–১৮৯০খ্রী)।... রামমোহন প্রসঙ্গে তাঁর সম্পর্কে কোন আলোচনা...কোথাও দেখেছি বলে মনে হয়না।...তিনি (লালন)

সারাজীবন ধরে অজস্র সঙ্গীতের মাধ্যমে নিজের ধর্ম ও দর্শনকে রূপ দিয়েছেন।...গ্রামবাংলায় বিভিন্ন বাউলসাধক ও মরমী কবি রচিত অসংখ্য গান ছড়িয়ে আছে। এইসব নিয়ে আলোচনা করলে বাউলধর্ম ও দর্শনের প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। আর উদার মানবতাবাদী ভাবধারা বিকাশে লালন শাহের ও রামমোহনের ভূমিকার এক তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। আর তার ফলেই কলকাতা শহরের বুদ্ধিজীবীদের ও গ্রামের উপেক্ষিত জনসাধারণের চিন্তাধারার ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা দেখতে পাই, পশ্চিমী হাওয়ার সংস্পর্শে না আসতে পারলেও গ্রামের সাধক ও মরমী কবিদের প্রভাবে এই উপেক্ষিত জনসাধারণের মনোজগৎ কলকাতার শিক্ষিতদের তুলনায় কম সমৃদ্ধ ছিল না।...দুর্ভাগ্যবশতঃ রামমোহনের ভূমিকা আলোচনায় লোকসংস্কৃতির প্রবাহটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।[৭৮]

আমাদের বিশ্বাস, নবজাগৃতির প্রেক্ষাপটে রামমোহন ও লালনের তুলনামূলক আলোচনা হলে দেখা যাবে লালনের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবতাবাদ, সংস্কার ও জাতিভেদ-বিরুদ্ধ মনোভাবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতোখানি। জানা যাবে লালনের মানবিক চিন্তাধারার প্রভাব বাঙলার গ্রামদেশের প্রাকৃত জনগোষ্ঠি এবং নগরবাসী কিছু শিক্ষিত কৃতী পুরুষের মনেও কী গভীর প্রভাব মুদ্রিত করেছিল, কতোখানি আন্তরিক ও অকৃত্রিম ছিলো সেই প্রচেষ্টা।

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যে প্রাণস্পন্দন জেগেছিল মূলত তা ছিলো কলিকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে এই জাগরণের জন্ম। কিন্তু সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ সর্বজনীন মানবচেতনাকে অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয়নি এই নবজাগৃতি। আধুনিক শিক্ষার আলোকবঞ্চিত বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে এর কোনো যোগ ছিলোনা। একদিকে যেমন বাঙালী মুসলমানের অশিক্ষা-রক্ষণশীল মনোভাব, অপরদিকে তাঁদের প্রতি জাতিগত স্বাতন্ত্র্যচিন্তার প্রতিপোষক বাঙালী হিন্দুর অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য বাঙালী মুসলমানের জন্য নবজাগৃতির কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অন্তরায় হয়েছিল। তাই এই জাগরণ মিলিত হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত প্রয়াসের ফসল নয়; বা এর

পরিণাম ফল হিসেবে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভব হয়নি। বরঞ্চ এর ফলে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিরোধ-ব্যবধান ও বিদ্বেষ-ভেদনীতি আরো স্পষ্ট হয়েছে। রেনেসাঁদীপ্ত বাঙালীর সাহিত্য-প্রচেষ্টায় এই জাতি-বৈর মনোভাব আজও অম্লান হয়ে আছে। জাগরণের এই নাগরিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি বাঙলার গ্রামদেশেও নীরবে-নিভৃতে চলছিল জাগৃতির প্রয়াস। বাউলগানে বিশেষ করে লালনের সাধনা ও গানে এই প্রয়াস হয়ে উঠেছিল গ্রামবাঙলার জাতধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনের প্রয়াস। নবজাগৃতির অন্যতম শর্ত যে—অসাম্প্রদায়িক মানববাদ তা এই অশিক্ষিত গ্রাম্য-সাধকদের বাণী ও সাধনার ভেতরেই সত্য হয়ে উঠেছিল—প্রাণ পেয়ে-ছিল। গ্রাম-বাঙলার এই মানবতাবাদী মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের প্রাণ-পুরুষ ছিলেন লালন শাহ।

সব কাল—সব যুগেই একদল মানুষ শাস্ত্রাচারের গণ্ডির বাইরে মানব-মুক্তি ও ঈশ্বর-লাভের পথ খুঁজেছেন। জাত-কুল-সম্প্রদায়কে তাঁরা দূরে সরিয়ে ধর্মকে হৃদয়ের সহজ সত্যের আলোকে চিনতে চেষ্টা করেছেন। বিবাদ-বিভেদের পথে না গিয়ে তাঁরা সমন্বয়-মিলনের অভিনব বাণী প্রচার করেছেন—মানুষনির্বিশেষে সবাইকে তাঁদের প্রেম বিলিয়েছেন। নীরস-কঠিন-প্রাণহীন শাস্ত্রকথাকে তাঁরা মর্মের সরসতায় সিক্ত করে পরিবেশন করেছেন। এ-ধারায় গড়ে উঠেছে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সন্তধর্ম ও ভক্তিধর্ম, আসামের মহাপুরুষিয়া মত, বাঙলার বৈষ্ণব-বাউল ও ছোটো-বড়ো আরো অনেক লৌকিক মতবাদ। এইভাবে মরমীসাধনার যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, তা শাস্ত্রশাসিত ধর্মান্ধ বৃহত্তর ভারতের মানবতাবাদ ও সম্প্রদায়-সম্প্রীতির ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। মন্দির-মসজিদের বাইরে তাঁরা মুক্তি খুঁজেছেন,—যে মুক্তির পথ সর্বমানবের কল্যাণ ও ভাল-বাসায় স্নাত। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও কলহ, জাতি-কুলগত বিভেদ ও বিরোধ, বর্ণ-শোষণ, সামাজিক ও শ্রেণী-বৈষম্য, আচারসর্বস্ব ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করে এঁরা জাত-কুল-ধর্ম-গোত্রের বিভেদ-বর্জিত, সর্ব-সংস্কারমুক্ত মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক উদার ধর্ম-ধারণার জন্ম দেন। চারিত্র্য-বিচারে বাঙলার বাউল এবং লালনের সাধনা-দর্শন এইসব মরমী সম্প্রদায় ও সাধনার সমানধর্মা।

বাউলমতের প্রবর্তনের পেছনে ধর্মজিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্মজ্ঞান অন্বেষণের পাশাপাশি সামাজিক শোষণ-অবিচার-বৈষম্য এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও জাতিভেদের মতো বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব ছিলো। এ-কারণেই সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারবঞ্চিত মানুষের জন্য একটি শাস্ত্রাচারহীন উদার ধর্মমতের সন্ধান অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিলো। সহজিয়া সাধনার প্রতি আকৃষ্ট এই মানুষগুলোই কালিক বিবর্তনে 'বাউল' নামে পরিচিত হয়েছে। অরবিন্দ পোদ্দার এই ধর্মসাধনার প্রেক্ষাপট আলোচনা করে সঙ্গতভাবেই বলেছেন:

> সমাজের দাবী তাঁরা সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করেছেন।...এই প্রত্যাখ্যানের পশ্চাতে গভীর দুঃখবোধ, সামাজিক ভেদ-বিচারের নির্মম উৎপীড়ন বর্তমান ছিল, তা বলাই বাহুল্য। যাঁরা উত্তরসাধনারূপে এই ভাবাদর্শ গ্রহণ করেছেন এবং সামাজিক কর্ম-সম্পর্কের বাইরে আপনার ঠাঁই খুঁজে নিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে না হলেও যাঁরা প্রথম প্রবক্তা, তাঁরা প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়া এ পথের পথিক হয়েছেন, এটা ভাবা কঠিন।[৭৯]

বাউলমতবাদে আকৃষ্ট ও দীক্ষাগ্রহণের পেছনে লালনের জীবনের মর্মস্পর্শী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

লালনের গানে ধর্ম-সমন্বয়, আচারসর্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধতা, মানবমহিমা-বোধ, জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গের প্রতি ঘৃণা, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ইত্যাদি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। মূলত তাঁর বিদ্রোহ চিরাচরিত শাস্ত্র-আচার ও প্রচলিত সমাজধর্মের বিরুদ্ধে। এইসব বক্তব্যের ভেতর দিয়ে তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবতাবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। লালন তাঁর আন্তরিক বোধ ও বিশ্বাসকে অকপটে তাঁর গানে প্রকাশ করেছেন। তাঁর আদর্শ ও জীবনাচরণের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের কোনো অমিল হয়নি—বিরোধ বাধেনি কখনো। লালনের এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যেও দেখা যায়। বিশেষ করে লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহের মধ্যে এই চেতনা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপস্থিত।

সমন্বিত ধর্মচেতনা মধ্যযুগের মরমী সাধকদের যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে, লালন শাহেও সেই চিন্তা ও প্রয়াস লক্ষণীয়। সাম্প্রদায়িক ধর্মের বাইরেই

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাউল লালনও মুক্তির পথ খুঁজেছেন। অখণ্ড মানবধর্মের জয়গানে তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত। ভক্ত কবীর বলেছেন:

এক নিরঞ্জন অল্‌হ মেরা, হিন্দু তুরুক দহূঁ নহী মেরা।
রাখূঁ ব্রত ন মহরম জানা, তিস হী সুমিরূঁ জো রহে নিদানা।
পূজা করূঁ ন নিমাজ গুজারূঁ, এক নিরাকার হিরদৈ নমস্কারূঁ।
না হজ জাঁউ ন তীরথ-পূজা, এক পিছান্যা তৌ ক্যা দূজা।
কহৈ কবীর ভরম সব ভাগা, এক নিরঞ্জন-সূ মন লাগা।

লালনের বক্তব্যও তাই। তিনি বলেছেন:

যে যা ভাবে সেই রূপে সে হয়।
রাম-রহিম-করিম-কালা এক আত্মা জগৎময়।।

আবার রহস্য করে অজ্ঞতার ভানের আড়ালে লালন বলেছেন:

রাম কি রহিম সে কোনজন
মাটি কি পবন জল কি হুতাশন
শুধাইলে তার অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না।।

ফোঁটা-তিলক, টিকি-টুপি নিয়ে ধর্মের বাহ্যিক যে আচার তার প্রতি লালনের কোনো আগ্রহ বা সমর্থন নেই। ধর্মের অর্থ তো ধারণ করা, হৃদয়ের উপলব্ধিতেই তার অস্তিত্ব। তাই এই আচার-অনুষ্ঠান অর্থহীন লোক-দেখানো ভড়ং ছাড়া আর কিছুই নয়। লালন স্পষ্টই বলেছেন:

মাটির ঢিবি কাঠের ছবি
ভূত ভাবে সব দেবা দেবী
ভোলেনা সে এসব রূপি
ও যে মানুষরতন চেনে।।

জীন-ফেরেস্তার খেলা
পেঁচাপেঁচি আলাভোলা
তার নয়ন হয়না ভোলা
ও যে মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে।।

এখানেও প্রাণহীন অসার বস্তু, অনৈসর্গিক বা অতি-প্রাকৃতিক শক্তির তুলনায় মানবীয় কর্ম ও মহিমাকে বড়ো করে দেখা হয়েছে।

আসলে লালনের গানে যেভাবে মানব-মহিমা কীর্তিত হয়েছে—প্রাধান্য পেয়েছে, তা যথার্থই যুগদুর্লভ অনন্য এক দৃষ্টান্ত। লালন তাঁর নীচের এই গানটিতে যেভাবে মানববন্দনা করেছেন তার তুলনা গ্রাম্য-সাহিত্যে নেই, ভদ্রসাহিত্যেও এ দৃষ্টান্ত বিরল। ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনকে সুকর্মে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান আছে এই গানে:

অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই।
দেব-দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে॥

কত ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে পেয়েছো এই মানবতরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়
যেন ভারা না ডোবে॥

সাধন-ভজনের জন্যও দেব-দেউল শাস্ত্র-স্মৃতি অগ্রাহ্য হয়ে প্রাধান্য পেয়েছে মানবদেহ। সাধন-ভজনের পথ-নির্দেশের জন্য কোনো 'আকাশবাণী' নয়—মর্তের মানবগুরুকেই অবলম্বন করা হয়েছে। মানবমুখীন চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ এইভাবে লালনের গানে জয়ী হয়েছে।

এদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গ দুষ্টক্ষতের মতো বিরাজিত ছিলো। এই কুপ্রথা ও কুসংস্কার ধর্মকে আশ্রয় করে সমাজজীবনে শক্ত আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। মধ্যযুগের মরমীসাধক ও ধর্মসংস্কারকেরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। কিন্তু মানুষের মনে এই সংস্কার ও বিভেদ এমন ছাপ ফেলেছে যে সহজে ও সমূলে এর উচ্ছেদ সম্ভব হয়নি। জাতবিচার সম্পর্কে তুলসীদাস বলেছেন, 'লোকেরা উত্তম-অধম বর্ণবিচার ক'রে জাতির গর্ব করে। কিন্তু পরমেশ্বরের ভজন বিনা চারটি জাতিই চামার হিসেবে গণ্য হয়।' সাধক পল্টুও একই কথা বলেছেন:

পল্টু, উঁচি জাতকা, মত কোই কর অহংকার।
সাহেবকা দরবারমে, কেবল ভক্তি পেয়ার॥

চেতনা ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে লালন এঁদেরই যোগ্য উত্তরসূরী। লালন তাই স্পষ্টই বলেছেন:

ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে তাঁর জাতের বিচার নাই।।
ভক্ত কবির জেতে জোলা
প্রেমভক্তিতে মাতোয়ালা
ধরেছে সে ব্রজের কালা
দিয়ে সর্বস্ব ধন তাই।।
রামদাস মুচি ভবের পরে
পেলো রতন ভক্তির জোরে
তার স্বর্গে সদাই ঘণ্টা পড়ে
সাধুর মুখে শুনতে পাই।।
এক চাঁদে হয় জগৎ আলো
এক বীজে সব জন্ম হলো
ফকির লালন কয় মিছে কল'
কেন করিস সদাই।।

শ্রেণী-বর্ণবিভক্ত ধর্মের আচার-শাসিত সমাজে ছুঁৎমার্গ, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ যে প্রবল সামাজিক ও মানবিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল তার বিরুদ্ধে লালন সবসময়ই ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। তাই বিশেষ ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছেন তিনি:

একবার জগন্নাথে দেখরে যেয়ে, জাত কেমন রাখ বাঁচিয়ে।
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে তাই লয় খেয়ে।।

আসলে,

ধর্মপ্রভু জগন্নাথ
চায়নারে সে জাত-অজাত
ভক্তের অধীন সে।।

এবং তাই,

যত জাত-বিচারী
দুরাচারী
যায় তারা সব দূর হয়ে।।

জাত-বিচার সম্পর্কে গান বাঁধতে গিয়ে লালন চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, 'গৌর কি আইন আনিলেন নদীয়ায়'; জাতিভেদ-পীড়িত এই সমাজের জন্য প্রতিবাদী এই 'আনকা আচার আনকা বিচার'—এই বিধান 'এতো জীবের সম্ভব নয়'। চৈতন্যের এই আইন কেমন, তার বর্ণনা দিয়ে লালন বলেছেন :

ধর্মাধর্ম বলিতে
কিছুমাত্র নাই তাতে
প্রেমের গুণ গায়।
জেতের বোল রাখলে না সে তো
করলে একাকারময় ॥

লালন এইভাবে জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করে এসেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে অনেকবারই। প্রথম জীবনে মুসলমানের গৃহে অন্ন-জল-আশ্রয় গ্রহণের জন্য লালনকে শুধু সমাজচ্যুতই হতে হয়নি, স্নেহময়ী জননী ও প্রিয়তমা পত্নীকেও হারাতে হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা যে কতো নির্মম ও বেদনাদায়ক তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে জানে। লালনের সাধকজীবনেও কুমারখালীতে ছুঁৎমার্গের দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল।[৮০] এসব কারণেই হয়তো তাঁর ভেতরে ভেতরে গড়ে উঠেছিল একটি প্রতিবাদী সত্তা। লালন তাই কখনোই জাতিত্বের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাননি। একজন বাউল হিসেবে তিনি জানতেন, জাতের সীমাবদ্ধতা মানুষকে খণ্ডিত ও কূপমণ্ডুক করে রাখে। তাই জাতধর্মের বিরুদ্ধে চরম বক্তব্য পেশ করে বলেছেন :

জাত না গেলে পাইনে হরি
কি ছার জাতের গৌরব করি
ছুঁসনে বলিয়ে।
লালন কয় জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে ॥

হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক বিরোধ তো ছিলোই, সাধনায় অগ্রসর হয়ে লালন দেখলেন এখানেও সেই ভেদ-বিরোধ। সাধনার রীতিনীতি আর

কলাকল সবই বিভক্ত। বিরক্ত লালন তাই উভয় মতকেই খারিজ করে দিয়ে সরাসরি বললেন:

ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোন রাগে।
আছে হিন্দু-মুসলমান দুইভাগে।।
থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ
হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন
ভেস্ত—স্বর্গ ফাটক সমান
কার বা তা ভাল লাগে।।

লালনের এই বক্তব্যের মধ্যে বিভেদহীন অখণ্ড মানব-ঐক্য-চিন্তার আভাস আছে। এই গানকে সাধক কবীরের দোঁহার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দুই সাধকের গানের আক্ষরিক ও আন্তর উভয় মিলই খুঁজে পাওয়া যায়। কবীর বলছেন:

হিন্দু মুখে রাম কহি মুসলমান খুদাই।
কহৈ কবীর সো জীবতা সৈঁ কদে ন জাই।।

অর্থাৎ 'হিন্দু মরে রাম রাম করে, মুসলমান মরে খোদা খোদা করে, ...এইসব ভেদবুদ্ধির মধ্যে যে না পড়ল সেই বাঁচল।'

এরপর লালন সরাসরি হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত বিরোধ ও বৈষম্যের প্রতি আলোকপাত করেছেন। এইক্ষেত্রে লালনের যুক্তি-সন্নিবেশের কৌশল লক্ষণীয়। হিন্দুসমাজের ছুঁৎমার্গের অর্থহীনতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে লালন বলছেন:

একই ঘাটে আসা যাওয়া
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া
কেউ খায়না কারো ছোঁওয়া
বিভিন্ন জল কে কোথায় পান।।

পাশাপাশি আবার প্রশ্ন করেছেন:

বেদ-পুরাণে করেছে জারি
যবনের সাঁই হিন্দুর হরি
আমি তা বুঝতে নারি
দুই রূপ সৃষ্টি করলেন কি তার প্রমাণ।।

মানবগোষ্ঠী যে এক, অখণ্ড ও অবিভাজ্য তার ইঙ্গিত আছে এই গানে।

লালনের আচার-আচরণ ও কথাবার্তা শুনে সমকালের মানুষ ধাঁধায় পড়েছিল তাঁর জাতিত্ব নিয়ে। জাতগর্বী সেইসব মানুষের কাছে জাত-ধর্মই ছিলো মানুষের বড়ো পরিচয়। লালনও বহুবার তাঁর জাত-ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছেন। সাম্প্রদায়িক জাতিত্বে অবিশ্বাসী লালন এই প্রশ্নের সরাসরি কোনো জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন। তাঁর সেই বক্তব্যের যুক্তি ও ভাষায় জাতবিচারী মানুষের অহংকার চূর্ণ হয়েছে। লালন স্পষ্টতই বলেছেন, তিনি হিন্দু না মুসলমান এ প্রশ্ন তাঁর কাছে অর্থহীন— অসমাধ্য, কেননা 'যাওয়া কিম্বা আসার বেলায় জেতের চিহ্ন রয় কাররে'। এ-বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ও আন্তরিক প্রতিবেদন :

সব লোকে কয় লালন ফকির হিন্দু কি যবন।
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান ॥

নিজের জাত-ধর্ম সম্পর্কে লালন যতোবার জিজ্ঞাসিত হয়েছেন ততোবার একই জবাব দিয়েছেন :

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয় জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে ॥

কেননা,

কেউ মালা কেউ তসবি গলায়
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কাররে ॥

তাই,

জগৎ বেড়ে জেতের কথা
লোকে গৌরব করে যথাতথা
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাধ—বাজারে ॥

এই গানে জাতিভেদ-প্রথার প্রতি লালনের তীব্র অসন্তোষ, শ্লেষ ও বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। এখানে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ও ছুঁমার্গীয় হীনমন্যতা নিন্দিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও কলহ নিরসনের চিন্তায় লালনের অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

লালনের গানে হিন্দু-মুসলমান উভয় ঐতিহ্যের যুগল-ব্যবহারের ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক উপলব্ধি, সমন্বয় ও মিলনের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে।

লালনের গান বাউলসম্প্রদায়ের গুহ্য-সাধনার বাহন হলেও এর ভেতরে মাঝে-মধ্যে বিস্ময়কর সমাজচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক অবিচার ও অসাম্য, ধর্মীয় গোঁড়ামি, শ্রেণী-শোষণ, আর্থনীতিক বৈষম্য এই মরমী সাধকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাই অধ্যাত্ম-উপলব্ধির অবসরে, প্রক্ষিপ্ত চিন্তার চিহ্ন হলেও, তিনি আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গে তাঁর অকপট-আন্তরিক বক্তব্য পেশ করেছেন। বিত্তবান ও বিত্তহীন, কুলীন ও প্রাকৃত, শোষক ও শোষিতে বিভক্ত সমাজে দরিদ্র-নিঃস্ব-নির্যাতিতের পক্ষভুক্ত প্রতিনিধি লালন এক আশ্চর্য সমাজসচেতন দৃষ্টি অর্জন করে বলেছেন:

কেমন ন্যায়বিচারক খোদা বল গো আমায়।
তাহা হলে ধনী-গরীব কেন এ ভুবনে রয়।।
ভাল-মন্দ সমান হ'লে
আমরা কেন পড়ি তলে
কেউ দালানকোঠার কোলে
শুয়ে আরাম পায়।।
সেই আমরা মরণের পরে
যাবি নাকি স্বর্গপুরে
কে মানিবে এসব হেরে
এই দুনিয়ায়।।[৮১]

মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ-বঞ্চনা-অবিচার-অবজ্ঞার চির-অবসান কামনা করে লালন শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত এক অভিনব সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। বলেছেন তিনি:

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে।
যেদিন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান
জাতি-গোত্র নাহি রবে।।
শোনায়ে লোভের বুলি
নেবেনা কাঁধের ঝুলি

ইতর-আতরাফ বলি
দূরে ঠেলে না দেবে ॥
আমির-ফকির হয়ে এক ঠাঁই
সবার পাওনা খাবে সবাই
আশারাফ বলিয়া রেহাই
ভবে কেউ নাহি পাবে ॥
ধর্ম-কুল-গোত্র-জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগির
কেঁদে বলে লালন ফকির
কে মোরে দেখায়ে দেবে ॥

উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য-ব্যবধান লালন অনুমোদন করেননি বলেই 'ধনী-গরীব কেন এ ভুবনে রয়' বলে স্রষ্টিকর্তার 'ন্যায়-বিচার' সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর আন্তরিক প্রত্যাশা ধর্ম-কুল-গোত্র-জাতিহীন সাম্যশাসিত সমাজে 'আমির-ফকির হয়ে এক ঠাঁই সবার পাওনা খাবে সবাই।' মানবাত্মার লাঞ্ছনায় কাতর, মানুষের দুর্দশা-দুঃখে ব্যথিত, মানবমুক্তির প্রত্যাশায় ব্যাকুল লালনের এই ব্যতিক্রমী উচ্চারণ তাঁকে অনায়াসে শোষিতজনের পরমবান্ধব সমাজমনস্ক এক অসাধারণ মরমী-মনীষী হিসেবে চিহ্নিত করে। আবহমান বাঙলার সংস্কার ও শোষণের অচলায়-তনের দুর্গে এমন শক্ত আঘাত এসেছে এক নিরক্ষর গ্রাম্যসাধকের নিকট থেকে—নিঃসন্দেহে এটি একটি বিস্ময়কর ঘটনা।

লালনের সাহসী সামাজিক ভূমিকার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে তাঁর পরম-বান্ধব কাঙাল হরিনাথকে জমিদারের সহিংস আক্রোশ থেকে রক্ষা করার ঘটনায়। হরিনাথ তাঁর 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে শিলাইদহের ঠাকুর-জমিদারদের প্রজা-পীড়নের সংবাদ প্রকাশ করলে জমিদারপক্ষ তাঁর ওপর অত্যন্ত রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হন। প্রতিশোধস্পৃহ জমিদারপক্ষ কাঙালকে শায়েস্তা করার জন্য দেশীয় লাঠিয়াল ও পাঞ্জাবী গুণ্ডা নিয়োগ করেন। কাঙালের অপ্রকাশিত 'দিনপঞ্জি' থেকে জানা যায়, জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর হাত থেকে বিপন্ন বন্ধু হরিনাথকে রক্ষার জন্য বাউলসাধক লালন ফকির "তাঁর দলবল নিয়ে নিজে লাঠি হাতে সেই লাঠিয়ালের দলকে আচ্ছা করে চিট করে সুহৃদ কৃষকবন্ধু হরিনাথকে

কুষ্টিয়া গাড়িনীপাড়া
হইতেও প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাক
মাশুল ২, টাকা।
নগদ মূল্য ১০ দুই পাই

পাক্ষিক পত্রিকা।

১ম ভাগ।	সন ১২৯৭ সাল। ১৫ ই কার্ত্তিক। ১ম পক্ষ। ইং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ। ৩১ এ অক্টোবর।	১৩শ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

বিষাদ-সিন্ধু॥

তৃতীয় ভাগ।

(এজিদ বধ পর্ব্ব।)

যন্ত্রস্থ

হিতকরীর গ্রাহক হইয়া অগ্রিম মূল্য ২, দুই টাকা আমার নিকট পাঠাইলে বৎসর-

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

কুষ্টিয়া রেলষ্টেসনের মাষ্টার মিঃ বার্ড সাহেবের বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ নিম্ন লিখিত কয়েকটী অপরাধের সংবাদ পান।——

(১) ষ্টেসন মাষ্টার কোটার মহাজনদিগের নিকট প্রতি মালগাড়ী বোঝাই দিতে ৩।৪ টাকা হিসাবে উৎকোচ লয়েন, তদ্ব্যতীত তিনি সহজে গাড়ী দেন না।

(২) কোন মাল ষ্টেসনে গাড়ী হইতে না-

ধরা পড়িয়াছেন। মিঃ বার্ড বুঝি উড়ন ছাড়েন। অনেক ষ্টেসনেই কিন্তু এরূপ কার্য্য চলিয়া থাকে।

——

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রধান২ মৌলবীগণ গোহত্যা নিবারণে বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন। কসাইয়ের নিকট কেহ গরু বিক্রয় না করে, এ জন্যে পঞ্চায়েত বসিয়াছে। আর বাঙ্গলায় দিন২ কসাইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

——

'হিতকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত লালন সম্পর্কিত নিবন্ধ

রক্ষা করেন।"[৮২] অন্য সূত্রে আরো জানা যায় দরিদ্র কৃষক ও প্রজা-সাধারণের পাশাপাশি "প্রসিদ্ধ বাউল লালন ফকিরের অগণিত শিষ্য-সামন্তও কাঙালের অমূল্য জীবনরক্ষার অন্যতম প্রহরী ছিলেন।"[৮৩]

লালন তাঁর উদার ও প্রগতিশীল মানসিকতার কারণে সমকালীন সমাজে যথেষ্ট নিন্দিত ও নিগৃহীত হয়েছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদীরাই লালনের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। মুসলমানের চোখে লালন বেশরা-বেদাতী নাড়ার ফকির,—আবার হিন্দুদের নিকটে ব্রাত্য-কদাচারী হিসেবে চিহ্নিত। ধর্মগুরু ও সমাজপতি উভয়ের নিকটেই লালনের বাণী ও শিক্ষা অস্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু লালন তাঁর ধর্মবাণীকে সমাজশিক্ষার বাহন করে ক্রমশ তার আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে যাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন।

আমাদের দেশে বাউলগান ও লালনগীতি সংগ্রহের ইতিহাস শতাব্দী-প্রাচীন। লালনসহ বিভিন্ন বাউলের জীবনীসংগ্রহ, বাউলতত্ত্ব ও গান নিয়ে আলোচনাও এর পরপরই শুরু হয়। বাউল বা লালনের গানের আধ্যাত্মিকমূল্য, সাধনমূল্য, শিল্পমূল্য ও অন্যান্য মরমীসঙ্গীতের সঙ্গে এর তুলনা-মূলক আলোচনা কিছু কিছু হলেও;—এর সামাজিক বা ঐতিহাসিক মূল্য নিয়ে বা অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবতাবাদ ইত্যাদি লক্ষণ নিয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক আলোচনায় সম্প্রদায়-সম্প্রীতি প্রচেষ্টায় বাউলগানের ভূমিকার তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আভাস দিয়ে বলেছিলেন:

> আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্যদেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন ক'রে এসেচে। বাউল-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি,—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েচে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরান-পুরাণে ঝগড়া

বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে-বিরোধে বর্ব্বরতা। বাঙলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচচ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ ক'রে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেচে, এই বাউলগানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।'[৪]

লালনের গান সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন বিশেষ প্রযোজ্য;—বোধকরি চারিত্র-বিচারে সবচেয়ে বেশি সত্য।

লালনের কাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বহমান কালের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে পুরোনো মূল্যবোধ ও রুচি। আজ বাউলের গান ও সাধনা পিছিয়ে পড়া সমাজের সংস্কৃতি। বাউলের বা লালনের সব গানও আজকের রুচি ও মানসিকতায় সমান মূল্য পাবেনা। ঐতিহাসিক কারণেই এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। তবু এই সম্প্রদায়ের বিশেষ করে লালনের গানের সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে। লালনের গান সমাজ-সম্পর্কের ধারা বেয়ে সাম্প্রদায়িকতা-জাতিভেদ-ছুঁৎমার্গ ইত্যাদি যুগ-সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের প্রতি ইংগিত দিয়েছিল। এই প্রয়াসের মাধ্যমে লালন সমাজসচেতন ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় দিয়েছেন তার স্বরূপ-নির্ণয় বাঙালীর প্রবহমান জীবনচর্যার মৌল প্রবণতার নির্দেশক বলেই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথ ও লালন শাহ

বাউলের দর্শন ও সঙ্গীত বাঙলার অনেক কৃতী পুরুষকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাউলদর্শন ও সঙ্গীতের বা'র-বাড়ীতে বিচরণ করেননি শুধু, আপনজনের মতো তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন, আত্মীয়তা স্থাপন করে একাত্ম হয়েছেন অবশেষে। তাঁর প্রাণধর্মের প্রেরণা আর বাউলের প্রেরণার উৎস ছিলো অভিন্ন। তাই বাউলের 'মনের মানুষ' তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'র একটি ঐক্য ও সাযুজ্যবোধ সহজেই আবিষ্কার করা সম্ভব। বাউলগানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানববাদী জীবনচেতনার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। বাউলের গান আর সহজ-সাধনার ভাব একসময়ে রবীন্দ্রমানসে নিবিড়ভাবে মিশে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ-কবিতা-গানে বাউলের প্রসঙ্গ নানাভাবে বহুবার এসেছে। বাউল-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগের কথা বিভিন্ন সূত্রে উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর আত্মজৈবনিক কবিতার ভাষ্যেও বাউলচেতনার সঙ্গে একাত্মতার পরিচয় ঘোষিত হয়েছে:

> তরুণ যৌবনের বাউল
> সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
> ডেকে বেড়ালো
> নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
> অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে।
>
> [পঁচিশে বৈশাখ : শেষ সপ্তক]

এইভাবে ক্রমশ তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন 'রবীন্দ্রবাউলে'। বাউলের গানের সুর, বাণী ও তত্ত্বকথা যেমন তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, তেমনি বাউলের বেশভূষায়ও তিনি প্রভাবিত হয়েছেন—বাউলের আলখাল্লা তাঁর পোশাকের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রমানসে এই বাউলপ্রভাবের মূলে লালনের

গান ও তাঁর শিষ্য-সম্প্রদায়ের সাহচর্য সবচেয়ে বেশি কাজ করেছিল বলে মনে হয়।

রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ

যে মরমীসাধকের প্রভাব রবীন্দ্রমানসে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় ও সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে দ্বিমত আছে। কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু অপরপক্ষের বক্তব্য, এই সাক্ষাৎকারের কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য বা প্রামাণ্য বিবরণী নেই, কেবল জনশ্রুতি ও অনুমানই এই ধারণার উৎস।

রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকারের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রকাশিত জলধর সেনের (১৮৬০—১৯৩৯) কাঙাল-জীবনীতে। লিখেছেন তিনি :

> শুনিয়াছি, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহের কুঠিতে লালন ফকির একবার গান করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ণ তিনটা পর্য্যন্ত গান চলিয়াছিল ; ইহার মধ্যে কেহ স্থানত্যাগ করিতে পারেন নাই।[৮৪]

তবে রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকারের ধারণাটি সবচেয়ে বেশি প্রচার ও প্রশ্রয় লাভ করেছে শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর একটি রচনার সৌজন্যে। 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' (বৈশাখ ১৩৫২) গ্রন্থে তিনি 'লালন ফকিরের সঙ্গে মোলাকাৎ' নামে একটি কাহিনী পরিবেশন করেন। এই কাহিনীই কথিত সাক্ষাৎকারের প্রধান উৎস। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে শচীন্দ্রনাথ এই মত প্রত্যাহার করে পাদটীকায় মন্তব্য করেন, এই সাক্ষাৎ হয়েছিল রবীন্দ্রভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। এ-বিষয়ে তিনি এক ব্যক্তিগত পত্রে

> লালন ফকিরের সম্বন্ধে "পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথে" যে ফুটনোট আছে, তা সত্যি। উপেনবাবু তাঁর "বাংলার বাউল ও বাউলগান" গ্রন্থে... বহু গবেষণা করে লিখেছেন যে, "লালনের মৃত্যু ১৮৯০ খৃঃ ১৭ অক্টোবর ১১৬ বছর বয়সে"। রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ে জমিদারীর ভার

পাননি; তাই সাক্ষাৎ হয়নি ধরা' যেতে পারে। তবে আমার ঐ কাহিনী অসত্য নয়, কারণ যার কাছে শোনা—সে ছেঁউড়েরই বুড়ো—সে বাজে কথা বলার লোক নয়। রবীন্দ্রনাথের স্থানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হবেন, কারণ ঐ সময়ে জ্যোতিবাবু ঘনঘন শিলাইদহ যেতেন ও থাকতেন। তাঁকেও প্রজারা "বাবুমশাই" বলত।"[৮৬]

শচীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর [লালন] পরিচয় ছিল কিনা তার বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীনেরা বলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এর আলাপ হয়েছিল, কিন্তু সেকথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।"[৮৭]

বসন্তকুমার পালের 'মহাত্মা লালন ফকির' গ্রন্থে 'প্রকাশকের নিবেদনে' অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন উল্লেখ করেছেন:

নিরক্ষর পল্লীবাসী হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা শুনিয়াছি জ্ঞানবৃদ্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত ফকিরের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। শিলাইদহে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রথম যেদিন তাঁহার ভাবের বিনিময় হয় তাহা জাহ্নবী-যমুনা-মহামিলনের ন্যায় রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গমতীর্থ রচনা করে।[৮৮]

শিলাইদহের সাধককবি গোঁসাই গোপালের (১৮৬৯—১৯১২) সঙ্গীত-সংগ্রহ 'গোপাল গীতাবলী'র সঙ্কলক ও প্রকাশক গোপাল-পুত্র রাসবিহারী জোয়ারদারও উল্লেখ করেছেন:

নদীয়া জেলায় কুষ্টীয়া মহকুমার অন্তর্গত শিলাইদহ একটি গ্রাম। ঠাকুরবংশের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পাদস্পর্শে পূত হইয়া গ্রামটির নাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। পূত গ্রামটি পবিত্র গঙ্গাসলিলা পদ্মা-নদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পদ্মার উপর বজরায় থাকিতেন এবং এখানেই তাঁহার কবিত্বশক্তির বিকাশ পায়।... সাধক লালন সাঁই প্রভৃতি বহু সাধু ও দরবেশ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। কবি রবীন্দ্রনাথ সাধক লালন সাঁইকে ভালবাসিতেন ও তাঁহার সুললিত গান একাগ্র মনে শ্রবণ করিতেন।[৮৯]

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন 'জনশ্রুতি'র সূত্র ধরে বলেছেন:

> কবি রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে লালন ফকীর তাঁহার শিলাইদহস্থ বোটে সাক্ষাৎ করিতে আসেন বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে।...সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী মহাশয়া লালনকে দেখিয়াছিলেন এবং বোটে তাঁহার গান শুনিয়াছিলেন।[২০]

অন্যত্র মনসুরউদ্দীন মন্তব্য করেছেন, "একটা আশ্চর্যের ব্যাপার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন শাহের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে কিনা তার নিশ্চিত কোন খবর পাওয়া যায় না।"[২১] আবার পাশাপাশি এ-কথাও বলেছেন:

> ...জানতে পারা যায় লালন শাহের মৃত্যুর পর শিষ্যসাগরেদের মধ্যে ২/৩ জন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে সাক্ষাৎ করেন। এবং রবীন্দ্রনাথ লালনের মৃত্যুর পর খবর শুনে লালনের শ্রাদ্ধশান্তির জন্যে নগদ দুইশত টাকা দান করেন।[২২]

সুকুমার সেন সূত্র-উল্লেখ না করেই জানিয়েছেন:

> সাধনা চালাইবার কালে রবীন্দ্রনাথ উত্তর-মধ্যবঙ্গে লালন ফকির ও আন্দী বোষ্টমীর মতো অনেক বাউল-বৈষ্ণব-দরবেশের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের গীতিনিষ্ঠ ধর্ম-অনুশীলনের পরিচয় পাইয়াছিলেন।[২৩]

বিনয় ঘোষও সাক্ষাৎকারের সপক্ষে তাঁর মত পোষণ করেছেন:

> ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাউলগানের সংগ্রহটি তাঁর হাতে পড়ার পর যখন বাংলা লোকসাহিত্যের গোপন রত্নভাণ্ডারের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, তার দু-তিন বছরের মধ্যেই মনে হয়, শিলাইদহে বিখ্যাত বাউল লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল।[২৪]

আনোয়ারুল করীম রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকার সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়ে বলেছেন:

> কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে বাউলফকির লালন শাহের যে যথেষ্ট হৃদ্যতা এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল আজ তা আর কারো কাছে অবিদিত নয়।...বৃদ্ধ লালন শাহ তাঁর হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলেন এই কবি বন্ধুটির জন্যে।[২৫]

লক্ষ্য করা যাবে, উপরিউক্ত মন্তব্য-অভিমত সবই কল্পিত, অনুমান কিংবা জনশ্রুতিনির্ভর, কেউই তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কোনো তথ্য-দলিল উপস্থিত করতে পারেননি।

রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকারের ধারণাটি নানা কারণে অনেকেই সমর্থন করেননি। একে অগ্রাহ্য করার পক্ষে তাঁরা বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রবন্ধে এই সাক্ষাৎ না হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, "আমার মনে হয় এই কাহিনী সম্পূর্ণ কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।"[৯৬] অন্নদাশঙ্কর রায়ও এ-বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করে মন্তব্য করেছেন, "...দুই জ্যোতিষ্কের সাক্ষাৎকার প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ।"[৯৭]

লালন ফকিরের গানের সঙ্গে আধুনিক মনের একটা সংযোগ আছে, সে-কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিলেন ;—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে এই মন্তব্য করার সময় বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, 'যদিও তাঁদের দেখাশুনা হয়নি'।[৯৮] সৈয়দ মুর্তাজা আলীর বক্তব্য, "কেউ কেউ লিখেছেন লালন ফকিরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখাশুনা ও আলাপ-আলোচনা হতো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন ফকিরের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।"[৯৯]

বিস্তৃত যৌক্তিক আলোচনা করে সনৎকুমার মিত্রও এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকার হয়নি।[১০০] চিত্তরঞ্জন দেবও এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারেননি।[১০১] রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরীও অনুমোদন করেননি সাক্ষাৎকারের কাহিনী।[১০২]

রবীন্দ্রনাথ-সমীপে পেশকৃত লালনশিষ্য মনিরুদ্দীন শাহের দরখাস্ত থেকেও এই ইঙ্গিত স্পষ্টই পাওয়া যায় যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি,—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ও যোগাযোগ ছিলো। তিনি লালনের একটি প্রতিকৃতিও অঙ্কণ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছেঁউড়িয়ার আখড়াবাড়ী "লালন সাহা ছাহেবকে নিষ্কর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু সাহা ছাহেব লোকান্তর হওয়ায় তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইয়াছিল না"। লালনের মৃত্যুর পর লালনশিষ্যদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথও ছেঁউড়িয়ার আখড়াকে নিষ্কর দানে অঙ্গীকার করেছিলেন।[১০৩]

... লালনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-বিষয়ে পক্ষে বা বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কোনোই ইঙ্গিত করেননি এই প্রচলিত ধারণাটি সঠিক নয়। তবে এ-সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-সংকলিত 'হারামণি'র (১ম খণ্ড : কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৩৭) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্ব্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হ'ত।" লালন ফকির এই নির্বিশেষ 'বাউলদলে'র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিনা সে-সম্পর্কে এখানে স্পষ্ট করে রবীন্দ্রনাথ কিছু বলেননি।

লালনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরস্পরবিরোধী দুটি বক্তব্য এখানে পেশ করা হলো।

১৯২২ সালে শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগের গ্রামসেবার কাজের ধারা নির্ধারণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে শান্তিদেব ঘোষের পিতা কালীমোহন ঘোষকে (১৮৮২—১৯৪০) বলেছিলেন:

> তুমি তো দেখেছো শিলাইদহতে লালন শাহ ফকিরের শিষ্য-গণের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কিরূপ আলাপ জমত। তারা গরীব। পোষাক-পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বোঝবার জো নাই তারা কত মহৎ। কিন্তু কত গভীর বিষয় কত সহজভাবে তারা বলতে পারত।[১০৪]

এই উক্তি থেকে ধারণা জন্মায় যে রবীন্দ্রনাথ লালন নন তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। লালনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকলে এ-ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখই অধিক গুরুত্ববহ ও প্রাসঙ্গিক হতো। আর আলাপ-পরিচয় থাকলে তা গোপনের কোনো কারণ আছে বলেও মনে হয়না—অস্বীকার করারও নেই কোনো যুক্তি।

আবার অপরপক্ষে নীচে বর্ণিত তথ্য থেকে মনে হতে পারে উভয়ের আলাপ-পরিচয় ছিলো। বসন্তকুমার পাল লালনজীবনী রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা প্রার্থনা করে তাঁকে পত্র দেন। কবির পক্ষ থেকে সেই চিঠির জবাব দেন তাঁর একান্ত সচিব সুধীরচন্দ্র কর। ২০ জুলাই ১৯৩৯ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে লিখিত পত্রে বসন্তকুমারকে জানানো হয়:

··সবিনয় নিবেদন,··

কবি আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছেন। আপনাকে এই মহৎ কাজে সাহায্য করতে পারলে তিনি আরো সুখী হতেন সন্দেহ নাই। ফকির সাহেবকে তিনি জানতেন বটে কিন্তু সে তো বহুদিন আগে; বুঝতেই পারেন এখন সে সব সুদূর স্মৃতির বিষয় তাঁর মনে তেমন উজ্জ্বল নয়। তবে তিনি বললেন, কলকাতায়, "লাল-বাংলা", ২০নং মে ফেয়ার, বালিগঞ্জ—এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায় থাকেন, তিনিও ফকির সাহেবকে জানতেন, তাঁর কাছে খোঁজ করলে অনেক বিষয় আপনার জানবার সুবিধা হোতে পারে।[১০৫]

'ফকির সাহেবকে [লালন] তিনি [রবীন্দ্রনাথ] জানতেন'—এই উক্তিটি অবশ্য উভয়ের আলাপ-পরিচয়ের ধারণাকে সমর্থন করে।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে জমিদারীর দায়িত্বভার নিয়ে আসেন ১৮৯০ সালের শেষদিকে, ততোদিনে লালনের মৃত্যু (১৭ অক্টোবর ১৮৯০) হয়েছে। তাই এইসময়ে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। তবে জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বাল্যকাল থেকেই বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার শিলাইদহে এসেছেন। সেইসময়ে লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব ছিলোনা। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে স্থির সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে সুস্পষ্ট তথ্য-প্রমাণের একান্তই অভাব। 'হারামণি'র ভূমিকায় বাউলদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ-প্রসঙ্গে কারো নামোল্লেখ করেননি তিনি। ফ্রান্সে প্রদত্ত 'An Indian Folk Religion' শীর্ষক বক্তৃতায়[১০৬] তিনি বাউলকবি গগন হরকরা বা বৈষ্ণব-সাধিকা সর্বক্ষেপীর নামোল্লেখ করে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের কথা বললেও লালন সেখানে অনুপস্থিত।

তবে এ-কথা অবশ্য-স্বীকার্য যে, লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হোক আর নাই হোক, লালনের গান রবীন্দ্রমানসে যে দূরপ্রসারী প্রভাব ও প্রেরণা বিস্তার করেছিল, সে-সম্পর্কে দ্বিমত বা বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।

রবীন্দ্রনাথের লালনচর্চা

জমিদারী পরিচালনার সূত্রে শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বাউল-ফকির ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সংস্পর্শে আসেন। এখানেই বাউলগানের সঙ্গে

তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। এই শিলাইদহেই চলমান বাউলজীবনের মরমী অন্বেষণকে তিনি অনুভব করেছেন হৃদয় দিয়ে, চিত্রিত করেছেন তাকে কবিতায়:

"কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা—হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার গভীর নির্জন পথে।
[পত্রপুট: পনেরো]

শিলাইদহে গগন হরকরা, কাঙাল হরিনাথ, গোঁসাই রামলাল, গোঁসাই গোপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী ও লালনের শিষ্যসম্প্রদায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এঁদের নিকটেই তিনি লালনের গান বিশেষভাবে শোনার সুযোগ লাভ করেন। লালন ফকির ও গগন হরকরার গান তিনি সুধীসমাজে প্রচার করেন।

বাঙালীসমাজে লালন সম্পর্কে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ সঞ্চারের জন্য রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মরমীসাধকের পরিচয়ের পরিধি প্রসারে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।[১০৭] রবীন্দ্রনাথ প্রথম লালনের গানের উল্লেখ করেন ভাদ্র-১৩১৪ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে:

আলখাল্লা-পরা একটি বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল:

খাঁচার ভিতর অচিন-পাখি কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

'গোরা' উপন্যাসের বিনয়ের আলস্যবশত বাউলকে ডেকে এই গানটি লিখে নেয়া হলোনা. কিন্তু "এ অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুন গুন করিতে লাগিল"।

এই একই গানের উল্লেখ মেলে 'জীবনস্মৃতি' (১৩১৯) গ্রন্থের 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে। প্রথম দু'টি পংক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন:

দেখিলাম, বাউলের গানও ঠিক ওই একই কথা বলিতেছে।...মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারেনা। এই অচিন পাখির যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।[১০৮]

১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনে 'The Philosophy of Our People' শীর্ষক সভাপতির ভাষণে তিনি 'অচিন পাখি'র এই গানের উল্লেখ করেন। লালনের এই গানটির সঙ্গে তিনি ইংরেজ কবি শেলীর কবিতার তুলনা করে শিরোপা দিয়েছিলেন বাঙলার মরমী কবিকেই:

> That this Unknown is the profoudest reality, though difficult of comprehension, is equally admitted by the English poet as by the nameless village singer of Bengal, in whose music vibrate the wing-beats of the unknown bird,—only Shelley's utterance is for the cultural few, while the Baul Song is for the tillers of the soil, for the simple folk of our village households, who are never bored by its mystic transcendentalism.

এরপর ১৩৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে, যা পরে 'ছন্দ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়, রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের দুটি সম্পূর্ণ গান ও একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে এর ছন্দ-সুষমা সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করেন। বলেছেন তিনি:

> প্রাকৃত-বাংলার দুয়োরানীকে যারা সুয়োরানীর অপ্রতিহতপ্রভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই 'অশিক্ষিত'—লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলাভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায়না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই।
>
> আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
> সে কি আর জপে মালা।
> নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।...

আর-একটি

> এমন মানব-জনম আর কি হবে।
> যা কর মন ত্বরায় কর
> এই ভবে।...

> এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেঁয়ে নয়। ছোটো-বড়ো নানাভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধুপ্রসাধনে মেজেঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশাকরি এমন কথা বলবার সাহস হবেনা কারো।[১০৯]

এই একই প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি 'বাঙালির দিনরাত্রির ভাষা'র নির্দশন হিসেবে লালনের 'কোথা আছেরে দীন দরদী সাঁই' এই গানটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন।

পারিবারিক-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ লালন শাহের কথা প্রথমে জেনেছিলেন বলে অনুমান করা চলে। শিলাইদহে জমিদারীর কার্যভার গ্রহণের পর লালনের গানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। শিলাইদহেরই মরমী কবি গগন হরকরার নিকটে তিনি লালনের গান শোনেন। লালন-শিষ্য-দের সাহচর্যও তাঁকে লালনের গান শোনার সুযোগ করে দেয়। লালনের গানের সহজ-সরল সুর ও উচচাঙ্গের তত্ত্বকথা তাঁকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে।

শিলাইদহে অবস্থানকালেই তিনি লালনের গান সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর জবানী থেকে জানা যায়, "বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি।"[১১০] কথিত আছে, তিনি ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের গানের খাতা আনিয়ে ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে ২৯৮টি গান নকল করিয়ে নেন। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী এক পত্রে

> লালন ফকিরের খেরোবাঁধা গানের খাতা চেয়ে নিয়ে কবি কতকগুলো গান নির্বাচিত করে পৃথক একখানা খাতায় ঐ রসিক বামাচরণবাবু-কেই নকল করতে দেন। ঐ খাতাখানি শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রভবনে' সংরক্ষিত আছে। আমি সেটা দেখেছি এবং বাউলসঙ্গীত ও ধর্মের গবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে দেখিয়েছি।[১১১]

কিন্তু এই খাতা সম্পর্কে সনৎকুমার মিত্র অনুমান করেছেন: "...'রবীন্দ্র-ভবনে'র খাতা দুটিই ছেঁউড়িয়ার আশ্রমের আসল খাতা এবং

যেভাবেই হোক তা 'রবিবাবু মশায়ে'র হাতে পৌঁছানোর পর আখড়ায় আর ফিরে আসেনি।"[১১২]

সনৎকুমার মিত্রের এই অনুমান যে সঠিক সে-বিষয়ে আমরা এখন নিঃসংশয়। রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গানের খাতার হস্তাক্ষর ও বর্তমান লেখক-সংগৃহীত জনৈক লালনশিষ্য কর্তৃক লিপিকৃত লালনগীতির সূচীপত্রের (দ্র. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত 'লালন স্মারকগ্রন্থ', পৃ. ১২৮ এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের গ্রন্থ 'লালন ও তাঁর গান', পৃঃ ১৫) হস্তাক্ষর অভিন্ন। লালনশিষ্যরাও বারবার বলেছেন রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের খাতা নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেননি। লালনগীতির সংগ্রাহক মতিলাল দাশকে লালন-শিষ্য ভোলাই শাহ বলেছিলেনঃ

> "দেখুন, রবিঠাকুর আমার গুরুর গান খুব ভালবাসিতেন, আমাদের খাতা তিনি লইয়া গিয়াছেন; সে খাতা আর পাই নাই, কলিকাতা ও বোলপুরে চিঠি দিয়াও কোনও উত্তর পাই নাই।"[১১৩]

এই একই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'আশ্রমের কর্তৃপক্ষেরা বলে যে, সাঁইজীর আসল খাতা শিলাইদহের 'রবিবাবু মশায়' লইয়া গিয়াছেন।"[১১৪] অন্নদাশঙ্কর রায় যখন কুষ্টিয়ার মহকুমা প্রশাসক তখন তিনিও লালনের গানের 'আসল পুঁথিখানি' 'কবিগুরুর কাছ থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য' করার জন্য কাঙাল হরিনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ও লালন-অনুরাগী ভোলানাথ মজুমদার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হন।[১১৫] অতএব এই সিদ্ধান্তই সমীচীন ও সঙ্গত যে রবীন্দ্রনাথ ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের মূল খাতাই সংগ্রহ করেছিলেন যা এখন 'রবীন্দ্র-ভবনে' সংরক্ষিত আছে। বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লালনের গান নকল করালেও সেই খাতার সন্ধান এখনো মেলেনি।

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের তৎকালীন আধিকারিক ডক্টর পশুপতি শাশমল বর্তমান লেখককে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালন-পাণ্ডুলিপির কয়েক পৃষ্ঠার আলোকচিত্র এবং পাণ্ডুলিপির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রেরণ করেন। উক্ত বিবরণটি নিম্নরূপঃ

> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট থেকে প্রাপ্ত রবীন্দ্রভবনস্থ পাণ্ডুলিপির মধ্যে লালন ফকিরের গানের খাতা দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এদের পরিগ্রহণ সংখ্যা : ১৩৮ (এ)—১ এবং ১৩৮ (এ)-২। দুটি খাতারই আখ্যাপত্রে পেন্সিলে লেখা পাওয়া যায় : Songs of Lalan Fakir—Collected by Rabindranath.

খাতার পিছন দিক থেকে লেখা শুরু হয়েছে, অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে শেষ পৃষ্ঠাকে (বাঁ দিকের পৃষ্ঠা) আখ্যাপত্র করা হয়েছে। সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে লাইন টেনে বেশ স্পষ্ট হস্তাক্ষর কালিতে গানগুলি লেখা। লাল পেন্সিলে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া আছে। লিখিত পৃষ্ঠার সংখ্যা সর্বমোট ১৬৩ (১ম খাতা—৬৮; ২য় খাতা—৯৫)। মোট গানের সংখ্যা ২৯৮। দুটি খাতার আয়তন ১৭ সেঃ মিঃ×২১ সেঃ মিঃ।[১১৬]

প্রথম খাতায় ১২৬ ও দ্বিতীয় খাতায় ১৭২টি গান সংকলিত হয়েছে। ৮টি গান দু'বার লিখিত, সেই হিসেবে গানের প্রকৃত সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯০।[১১৭] সনৎকুমার মিত্রের হিসেবে 'রবীন্দ্রভবনে'র রক্ষিত দু'টি খাতায় (৬৭ - ৯৫) গানের সংখ্যা ২৯৭, এরমধ্যে ১২টি গানের পুনরাবৃত্তি ঘটায় গানের প্রকৃত সংখ্যা ২৮৫।[১১৮]

'রবীন্দ্রভবনে' রক্ষিত লালনের গানের খাতায় রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বহস্তে সংশোধন করেছেন। প্রথম খাতার কোনো গান তিনি সংশোধন না করলেও 'দ্বিতীয় খাতায় ১০৪, ১০৬ ও ১২১ সংখ্যক গান তিনটিতে পাঁচটি জায়গায় কয়েকটি শব্দ কবি স্বহস্তে কেটে তার মাথায় শুদ্ধ পাঠ লিখে রেখেছেন'।[১১৯] রবীন্দ্র-সংগৃহীত লালনের গানের একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রকাশ করেন চিত্তরঞ্জন দেব ('পরিচয়', চৈত্র ১৩৬৪)। এই সংগ্রহের আলোকচিত্র প্রতিলিপি প্রথম মুদ্রিত হয় আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত 'লালন স্মারকগ্রন্থে' (ঢাকা, চৈত্র ১৩৮০)। রবীন্দ্র-সংগৃহীত এই গানের খাতা থেকে সনৎকুমার মিত্র মূল বানানের অশুদ্ধ রূপ অবিকৃত রেখে হুবহু ২৮৫টি গান প্রকাশ করেন তাঁর 'লালন ফকির : কবি ও কাব্য' (কলিকাতা ১৩৮৬) গ্রন্থে।

'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২২ সালের বৈশাখ মাস থেকে লোকসঙ্গীত প্রকাশের জন্য 'হারামণি' নামে একটি নতুন বিভাগ প্রবর্তিত হয়। সূচনাতেই প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্র-সংগৃহীত গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' এই গানটি। ১৩২২ সালের আশ্বিন

থেকে মাঘ পর্যন্ত চার কিস্তিতে রবীন্দ্র-সংগৃহীত লালনের মোট কুড়িটি গান প্রকাশিত হয়। এই কুড়িটি গানের মধ্যে মাত্র আটটি গান 'রবীন্দ্রভবনে' রক্ষিত খাতা থেকে গৃহীত। এ-থেকে ধারণা হয় রবীন্দ্রনাথ অন্য সূত্র অর্থাৎ লালনশিষ্য কিংবা শিলাইদহের বাউলদের নিকট থেকেও লালনের গান সংগ্রহ করেছিলেন।

রবীন্দ্রমানসে লালন-প্রভাব

বাউলের গানের সুর ও বাণী, তত্ত্ব ও শিল্প রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। এইসব গান তাঁর চিত্ত ও শিল্পলোক উভয়কেই প্রভাবিত করেছে। বলেছেন তিনি:

> ...বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি।...আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলসুরের মিল ঘটেচে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন্ একসময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে।[১২০]

অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন, "আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের, কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করিনি, সেগুলো স্পষ্টত রবীন্দ্রবাউলের রচনা।"[১২১] বাউলভাবনার সপক্ষে তাঁর এই মানস-রূপান্তরে লালনের প্রভাব গভীর ও প্রত্যক্ষ।

লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়' রবীন্দ্রনাথের ভাবজগতের পরিচালিকা-শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই গানটি তাঁর জীবনচেতনার প্রেরণা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সুকুমার সেন যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "বাউলগানের এই...পদটি কবিচিত্তে দীক্ষাবীজ বপন করিয়াছিল।"[১২২] এ-বিষয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, "...লালন ফকিরের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়' এই জিজ্ঞাসার সহিত রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসার গভীর মিল ছিল...।"[১২৩]

লালনের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও মনোযোগ যে কতো গভীর ছিলো, তাঁর পাঠ্যতালিকায় লালন যে কতোখানি গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন সে-

সম্পর্কে জানা যায়:

'বেদ-উপনিষদ' থেকে 'বাইবেল' ও লালন শাহের জীবনী সর্বদা তাঁর টেবিলে থাকত।[১২৪]

বাউলতত্ত্ব ও দর্শন, যা লালনে এসে সংহত ও একটি পূর্ণরূপ লাভ করেছে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাউল-গান, বিশেষ করে লালনের গান, রবীন্দ্রমননে যেমন তাঁর সঙ্গীতেও তেমনি স্পষ্ট ছাপ ফেলেছে—প্রেরণা হয়েছে অনেক কবিতার। রবীন্দ্রনাথের গানে লালনগীতির কথা ও সুরের প্রভাব ও সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। লালন একটি গানে বলছেন:

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে॥

সেই একই আর্তি ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের গানে:

ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে
ও বন্ধু আমার!
না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে নারে॥

এই গানটি লালনের গানের পরিপূরক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। একজনের উচচারণ, তাঁর দেহঘরের মুক্তিচাবি অপরের হাতে, অপরজন সেই মুক্তিদাতাকে আহ্বান করছেন সখারূপে।

দেহবিচারই বাউলসাধনার মূল বিষয়। আপন দেহঘরে যে পরম-পুরুষের বাস, তাঁকে না চিনলে সাধনসিদ্ধি হয় না। লালন ফকির তাই বলেছেন:

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
আমি জনম-ভর একদিন দেখলাম নারে॥
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
দেখতে পাইনে এই নয়নে
হাতের কাছে যায় ভাবের হাটবাজার
আমি ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে॥

লালন শাহের সমাধি-সৌধ

পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ বলেন:

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাইনি
তোমায় দেখতে আমি পাইনি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাইনি ।।

নিজেকে জানতে-চিনতে পারলেই সেই 'অচিন মানুষে'র সন্ধান পাওয়া যায়। এই আত্ম-অণ্বেষণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সকল পরিচয়ের কথা। লালন বলেন:

যার আপন খবর আপনার হয়না।
আপনারে আপনি চিনতে পারলে
যাবে সেই অচিনারে চিনা ।।

রবীন্দ্রনাথ বাউলের এই বাণীকেই বুকের মধ্যে লালন করে গেয়েছেন:

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবেনা।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা ।।

লালনের অন্তিম মুহূর্তে রচিত 'পার করো হে দয়ালচাঁদ আমারে' এই গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষপ্রান্তে রচিত গান 'সমুখে শান্তিপারাবার ভাসাও তরুণী হে কর্ণধারে'র ভাবগত আত্মিক মিল লক্ষণীয়।

এ-ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আরো কিছু বাউলাঙ্গের গান আছে যাতে লালনের গানের ভাব-ভাষা-ভাবনার আভাস চোখ এড়িয়ে যায় না। যেমন:

১. খ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়। (লালন)
খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে। (রবীন্দ্রনাথ)

২. আছে যার মনের মানুষ মনে, সে কি জপে মালা। (লালন)
সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়নদ্বারে? (রবীন্দ্রনাথ)

৩. আমার মনের মানুষেরি সনে মিলন হবে কতদিনে। (লালন)
আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে। (রবীন্দ্রনাথ)

৪. ঐ এক অজান মানুষ ফিরছে দেশে...(লালন)
সে যে বাহির হল আমি জানি। (রবীন্দ্রনাথ)

৫. আমারে কি রাখবেন গুরু চরণদাসী / ইতরপানা কার্য আমার অহর্নিশি ।।
(লালন)

আমি কেবল তোমার দাসী। কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালবাসি ।।
(রবীন্দ্রনাথ)

৬. কারে বলবো আমার মনের বেদনা / এমন ব্যথায় ব্যথিত মেলেনা ।।
(লালন)

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ। (রবীন্দ্রনাথ)

৭. কেন কাছের মানুষ ডাকছো শোর করে। / আছিস তুই যেখানে, সেও সেখানে খুঁজে বেড়াও কারে ।। (লালন)

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, / তাই হেরি তায় সকলখানে ।।
(রবীন্দ্রনাথ)

এমনি করে আরো উদাহরণ পেশ করা যায়। সে-সব গানের বিশেষ বিশেষ শব্দ, রূপক, প্রতীক, উপমা, চিত্রকল্প, ভাব ও সুর কখনো আংশিক আবার কখনো বা পরোক্ষ উপায়ে বাউল বা লালনের গান থেকে গৃহীত। ওপরের গানগুলো বিচার করলেই বোঝা যায় লালনের গান রবীন্দ্রনাথকে কতোখানি আকৃষ্ট করেছিল—কীভাবে প্রভাবিত করেছিল! সাহিত্য সম্পর্কে ধারণাহীন নিরক্ষর লালনশিষ্যরা "কবিগুরুকে লালনের চেলা বলিয়া মনে করে এবং বলে যে, কবিগুরু লালনের গানকে রূপান্তরিত করিয়াই জগৎ-জোড়া নাম কিনিয়াছেন।"[১২৫]

রবীন্দ্রনাথের নাটকেও বাউলভাবনার অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে। তাঁর রূপক বা সাংকেতিক নাটকের প্রায় প্রত্যেকটিতেই তিনি বাউল-চরিত্র সংযোজন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি নাটকে লালনীয় প্রভাবে বাউলের তত্ত্ব-দর্শনের সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। জানা যায়:

> ...বাউলতত্ত্বের উপর তিনি সে যুগের তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করেছিলেন, তাঁর নাম 'রাজা'। বৌদ্ধ আখ্যান থেকে তিনি 'রাজা' নাটকের কাহিনী গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বাংলার বাউলের ভাবটি তার উপর আরোপ ক'রে নিয়ে তাঁকে অনবদ্য সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছেন। একটি বাউলগানে আছে, 'সে যে কথা কয় দেখা দেয়না'; এই ভাবটিকেই

তিনি বৌদ্ধ আখ্যায়িকাটির ভিতর দিয়ে প্রকাশ ক'রে তার মধ্য দিয়ে নিজের অধ্যাত্ম ধ্যান-ধারণার পরিচয় প্রকাশ করেছে।[১২৩]

'কে কথা কয়রে দেখা দেয়না'—লালনের এই প্রাতিস্বিক গানের ভাব-সত্যকে তিনি তাঁর 'রাজা' নাটকে রূপায়িত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শক্তিমান, সচেতন অসামান্য এক শিল্পী-পুরুষ। তাই তিনি লালনের বাণী ও সুরকে ভেঙে 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে' নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন, যা একান্তই রবীন্দ্রবাউলের রচনা। রবীন্দ্রনাথের মরমী-মানসে লালন ছিলেন প্রেরণার এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎস। কালজয়ী এই দুই গীত-প্রতিভা সম্পর্কে এ-কথা হয়তো বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ নিরক্ষর হলে লালন ফকিরের মতো মরমী কবি হতেন, আর লালন শাহ শিক্ষিত হলে হতেন রবীন্দ্রনাথের মতো বিদগ্ধ কবি।

লালনচর্চার ইতিহাস

বাঙালীসমাজে লালনের নাম আজ সুপরিচিত। তাঁর জীবৎকালেই তিনি বাঙলার বিদ্বদ্‌সমাজের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁর সমকালেই তাঁকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত এবং তাঁর গান সংগ্রহ ও প্রকাশের উদ্যোগ গৃহীত হয়।

এ-যাবত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাঙাল হরিনাথের রচনাতেই প্রথম লালন শাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৭] সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় (১০ম ভাগ ১৭শ সংখ্যা : ভাদ্র ১ম সপ্তাহ, ১২৭৯ : আগষ্ট ১৮৭২ ; পৃ: ৩) 'জাতি' শীর্ষক এক সংবাদ-নিবন্ধে লালন ফকিরের উল্লেখ মেলে। 'গ্রামবার্ত্তা'র নিবন্ধকার লিখেছেন :

> ...সকলেই ব্রাহ্ম ও ধর্ম্মসভার নাম শুনিয়াছেন। গৌরসভা নামে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা আর এক সভা স্থাপন করিয়াছে। ইহার নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। গৌরবাদী বক্তা এক ২ পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া, সভা করিয়া গৌরাঙ্গের চরিত ও লীলাদি বর্ণন করে, স্ত্রীপুরুষে ৩/৪ শত লোক এক ২ সভায় উপস্থিত থাকে। ইহারা স্বধর্ম্মের মধ্যে, জাতিভেদ স্বীকার করেনা, কুরি, কামার, কুমার, তেলি, জালিক, ছুতার প্রভৃতি সকলেই একসঙ্গে আহার করে। এই দলে মুসলমান আছে কিনা জানিতে পারা যায় নাই। লালন শা নামে এক কায়স্থ আর এক ধর্ম্ম আবিকার করিয়াছে। হিন্দুমুসলমান সকলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা মাসিক পত্রিকায় ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব। ৩/৪ বৎসরের মধ্যে এই সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল হইয়াছে। ইহারা যে জাতিভেদ স্বীকার করেনা সে কথা বলা বাহুল্য। এখন পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখুন, এদিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম জাতির পশ্চাতে খোঁচা মারিতেছে, ওদিকে গৌরবাদিরা তাহাকে আঘাত করিতেছে, আবার সে দিকে সম্প্রদায়িরা, ইহার পরেও স্বেচ্ছাচারের তাড়না আছে। এখন

জাতি তিষ্ঠিতে না পারিয়া, বাঘিনীর ন্যায় পলায়ন করিবার পথ দেখিতেছে।

'গ্রামবার্ত্তা'র প্রায় সব সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও সংবাদ-নিবন্ধ কাঙাল হরিনাথ নিজেই রচনা করতেন। তাই অনুমান করা চলে এই সংবাদ-নিবন্ধের রচয়িতাও হরিনাথ নিজেই। অবশ্য এখানে নিবন্ধকার লালন সম্পর্কে আলোচনার জন্য নিবন্ধ রচনা করেননি, প্রসঙ্গক্রমে লালনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং লক্ষ্য করা যাবে নিবন্ধ-রচয়িতার মন্তব্য লালনের অনুকূলে ছিলোনা। তাঁর 'ব্রহ্মাণ্ডবেদে' (১ম ভাগ ১ম সংখ্যা : ১২৯২) হরিনাথ লালনের একটি গান ('কে বোঝে সাঁয়ের লীলাখেলা') সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেন। 'ব্রহ্মাণ্ডবেদের'র ৩য় ভাগ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (১২৯৭) লালনের এই গানটির স্বরে বাঁধা তাঁর কয়েকটি গানের উদ্ধৃতি দেন। এই 'ব্রহ্মাণ্ডবেদের'ই (২য় ভাগ ১ম সংখ্যা) পাওয়া গেলো লালনের সংক্ষিপ্ততম পরিচিতির একটি আভাস। হরিনাথ তাঁর অপ্রকাশিত দিনলিপিতেও তাঁর বিপন্ন-দিনের বন্ধু লালনের কথা উল্লেখ করেছেন। লালনচর্চার উদ্বোধক হিসেবে কাঙাল হরিনাথের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচচারণ করতে হয়। কালক্রমানুসারে এ-বিষয়ে পথিকৃতের মর্যাদা তাঁরই প্রাপ্য।

এরপর মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭—১৯১২) 'সঙ্গীত লহরী'র (১৮৮৭) একটি গানে লালনের নাম পাওয়া যায়। যতদূর মনে হয় হরিনাথের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে লালনের সঙ্গে মশাররফের আলাপ-পরিচয় হয়। মীরের জন্মগ্রাম লাহিনীপাড়া লালনের সাধনক্ষেত্র ছেঁউড়িয়ার নিকটবর্তী গ্রাম। লালনের নামযুক্ত গানটির অংশবিশেষ হলো এই :

> আরে ভাই না পাই দিশে, কলির শেষে,
> কিসে, কার মন মজেছে।
> ফিকিরচাঁদে, আজবচাঁদে,
> রসিকচাঁদে সব নেতেছে।
> কোথা আর পাগল কানাই, লালন গোঁসাই,
> সব সাঁই এতে হার মেনেছে।[১২৮]

লালন সম্পর্কে প্রথম বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় মীর মশাররফ হোসেন পরিচালিত পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকায়। লালনের মৃত্যুর (১৭ অক্টোবর

১৮৯০) পরপরই (১৪ দিনের ব্যবধানে) ১৮৯০ সালের ৩১ অক্টোবর (১৫ কার্তিক ১২৯৭) 'হিতকরী' পত্রিকার (১ম ভাগ ১৩শ সংখ্যা : পৃঃ ১০০-০১) সম্পাদকীয়-স্তম্ভে 'মহাত্মা লালন ফকীর' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হলেও তা তথ্যবহুল, প্রামাণিক ও সুলিখিত। লালন ফকিরের কিংবদন্তী-শাসিত জীবনকাহিনীর রহস্য-উন্মোচনে এই নিবন্ধটি গবেষকদের বিশেষ সহায়ক হয়েছে। পারিপার্শ্বিকতা-বিচারে অনুমান হয় এই নিবন্ধটি রচনা করেছিলেন 'হিতকরী'র সহ-সম্পাদক ও কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট আইনজীবী রাইচরণ দাস (১৮৫৯—১৯৩২)।[১২৯] অন্যত্রও রাইচরণের লেখায় লালনের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৩০] লালনশিষ্যরা 'হিতকরী'র এই বিবরণকে প্রামাণ্য জেনেই পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যাটি আখড়ায় দীর্ঘকাল সযত্নে সংরক্ষণ করেন। বসন্তকুমার পাল উল্লেখ করেছেন, "তাঁহার [লালন] শিষ্য ভোলাই সাহ ও পাঁচু সাহের নিকট শুনিলাম হিতকরী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে সাঁইজীর বিষয় যাহা লেখা হইয়াছিল উহা সর্ব্বৈব সত্য।"[১৩১]

লালনের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর সরলা দেবী 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০২ সালের ভাদ্র-সংখ্যায় 'লালন ফকির ও গগন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে লালনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ এগারোটি গান প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সহায়তায় লেখিকা লালনের এই সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান পরিচিতিটি সংগ্রহ করেন।

যশোর জেলার শৈলকুপার সব-রেজিস্ট্রার মৌলভী আবদুল ওয়ালী ৩০ নভেম্বর ১৮৯৮ এশিয়াটিক সোসাইটির এক সাধারণ অধিবেশনে 'On Curious Tenets and Practices of a Certain Class of Faqirs in Bengal' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রসঙ্গক্রমে লালন সম্পর্কে কিছু মন্তব্য পেশ করেন। লালন ও তাঁর গুরু সিরাজ শাহ উভয়েরই জন্ম ঝিনাইদহ মহকুমার হরিশপুর গ্রামে এবং লালন 'কায়স্থ' হিসেবে পরিচিত ছিলেন বলে তিনি মত পোষণ করেছেন।[১৩২]

দুর্গাদাস লাহিড়ীর (১৮৫৮ ?—১৯৩২) 'বাঙ্গালীর গান' (১৩১২) ও অনাথকৃষ্ণ দেবের (?—১৯১৯) 'বঙ্গের কবিতা' (১৩১৮) গ্রন্থে লালনের গান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সংকলিত হয়। কুমুদনাথ মল্লিকের (১৮৮০—১৯৩৮)

'নদীয়া কাহিনী'তে (প্র-স.১৩১৭) একটি গানসহ লালনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাওয়া যায়।[১৩৩] 'শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ' গ্রন্থে লালনের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে:

> লালন শাহের রচিত পদ শুনিলেই বুঝা যায় লালন যেমনই প্রতিভা-শালী তেমনই উচ্চশ্রেণীর সাধক। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা নিম্নে একটি পদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।
>
> (আমার) ঘাড়ীর কাছে আরশিনগর,
> এক পড়শী বসত করে
> আমি একদিনও না দেখলাম তারে। ..
>
> এই পদে লালন পড়শী বা প্রতিবেশী শব্দে শ্রীভগবানকে অভিহিত করিয়াছেন এবং 'আরশিনগর' অর্থাৎ দর্পণ-নগর শব্দে দ্বিদলপদ্মস্থান ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আজ্ঞাচক্রেই জ্যোতি ও রূপ দর্শন হয় বলিয়া বাউলগণ উহাকে 'রূপের ঘর' বলিয়া থাকেন।[১৩৪]

লালনচর্চায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-বিষয়ে আমরা পূর্ব-অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তবে এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে. 'প্রবাসী'তে 'হারামণি' বিভাগ চালু হলে রবীন্দ্রনাথের (আশ্বিন-মাঘ ১৩২২) পূর্বেই লালনের গান প্রকাশ করেন সতীশচন্দ্র দাস (আষাঢ় ১৩২২) ও করুণাময় গোস্বামী (ভাদ্র ১৩২২)।

কাঙাল-শিষ্য জলধর সেন তাঁর 'কাঙ্গাল হরিনাথ (১ম খণ্ড : ১৩২০) গ্রন্থে ফিকিরচাঁদের বাউলদল গঠনের প্রেরণা তাঁরা লালন ফকিরের নিকট থেকে কিভাবে লাভ করেছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন। লালনকে প্রত্যক্ষদর্শী জলধর তাঁর এই গ্রন্থে লালন সম্পর্কে চুম্বক-মন্তব্যসহ একটি গান প্রকাশ করেছেন!

কাঙাল হরিনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র কুমারখালীর ভোলানাথ মজুমদার লালনের জীবনী ও গান সংগ্রহ করেছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-সূত্রে জানা যায়:

> কুমারখালী-নিবাসী বৃদ্ধ শ্রীভোলানাথ মজুমদার মহাশয় ঐ অঞ্চলে সর্বপ্রথম লালনের গান সংগ্রহ করেন এবং লালনের সম্বন্ধে

কয়েকটি প্রবন্ধও দু-একটি সভায় পাঠ করেন। লালন তাঁহার পিতৃবন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে ছেলেবেলায় তিনি লালনকে দেখিয়াছেন।[১৫]

তিনি লালন সম্পর্কে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। কুমারখালীর এককালীন সব্-রেজিষ্ট্রার ও শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের (১৮৬০–১৯৩৩) পুত্র এম. আশরাফউল হক (জ. ১৯০৯) ভোলানাথ মজুমদারের নিকট লালনজীবনীর এই পাণ্ডুলিপি দেখেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ও গোপীপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পাক্ষিক 'দীপিকা' পত্রিকায় (কুষ্টিয়া, ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪০/২৫ নভেম্বর ১৯৩৩) এই গ্রন্থের একটি বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়েছিল:—" ফকির লালন সাঁই" (বহু মনীষী প্রশংসিত) শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।" 'আমার পল্লী-মা' নামে ভোলানাথের এক কবিতায় (দীপিকা': ১০ আষাঢ় ১৩৪০/ ২৪ জুন ১৯৩৩) কুমারখালীর ইতিহাস-ঐতিহ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে লালনের উল্লেখ আছে:

সাঁইজী লালন মর্ত্যে দেবতা করিল ধন্য পুণ্য এ মাটি,
ফকির আমার মায়ের এ ঘরে জ্বালিল স্বরগ ধূপের কাঠি:—
মূর্খ জানিল কণ্ঠে বহিয়া, স্বর্গের গীতি ঘরে ঘরে গিয়া—
শুনাল গাহিয়া, লইল কাড়িয়া পল্লীবাসীর সরল প্রাণ!
মূর্খ কবির জন্মভূমি এ, ফকির কবির সমাধিস্থান,
পল্লী-কুঞ্জে রহিয়া গেল গো কত কোকিলের কাকলী তান।

ভোলানাথ মজুমদার সংগৃহীত লালনজীবনীর তথ্য ও গান উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও ব্যবহার করেন। ভোলানাথের পুত্র নীলরতন মজুমদারও পিতার সংগ্রহ অবলম্বনে 'দীপিকা' পত্রিকায় (৪,১৫ ও ৩২ আষাঢ় ১৩৩৯) 'ফকির লালন সাঁই' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ভোলানাথ মজুমদারের আরেক জ্ঞাতি বিশ্বনাথ মজুমদারও তাঁর সংগ্রহের সাহায্যে 'লালন ফকির' নামে প্রবন্ধ রচনা করেন এবং তা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় (২৯ এপ্রিল ১৯৪১) প্রকাশিত হয়।

লালনচর্চা ও গবেষণায় কাঙ্গালকুমার পালের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লালন সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ ('প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৩২) ও প্রথম গ্রন্থ ('মহাত্মা লালন ফকির', ১৩৬২) রচনার কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। 'প্রবাসী'

পত্রিকায় প্রকাশিত লালন সম্পর্কে তাঁর দু'টি প্রবন্ধ (শ্রাবণ ১৩৩২ ও বৈশাখ ১৩৩৫) সুধীজন ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বসন্ত-কুমারের পৈতৃক নিবাস লালনের জন্মগ্রাম ভাঁড়ারার পার্শ্ববর্তী ধর্মপাড়া গ্রামে। বাউল-পরিমণ্ডলেই তাঁর জন্ম। তাই বাল্যকালেই লালন ফকির সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জন্মায়। তিনি বলেছেন, "শৈশবে তাঁহার [লালন] সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী শুনিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তথাদি সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করি।"[১৩৬] বসন্তকুমারের 'মহাত্মা লালন ফকির' গ্রন্থটি লালন-গবেষণার ক্ষেত্রে আকর গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০—১৯৭৭) তাঁকে লালনচর্চার 'পথিকৃৎ' বলে অভিহিত করেছেন।[১৩৭]

বাঙলার লোকসঙ্গীত সংগ্রহে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের অবদান বিশেষ স্মরণীয়। বাউলগান সংগ্রহ ও লালনচর্চায় তাঁর প্রয়াস ও সাফল্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরে তিনি অনলসভাবে বিশেষ উদ্যম ও একাগ্রতা নিয়ে লালনের গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন। এ-যাবত তিনিই সবচেয়ে বেশী লালনের গান সংগ্রহ করেছেন। 'হারামণি'র বেশ কয়েক খণ্ড, 'লালন ফকিরের গান' নামীয় সংকলন-গ্রন্থ ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি লালনের গান প্রকাশ করেছেন। মনসুরউদ্দীনের সংগ্রহ-পদ্ধতি 'যৎ শ্রুতং তৎ লিখিতং' এবং তাঁর সংগৃহীত লালনগীতি অনেকক্ষেত্রে খণ্ডিত ও অসম্পাদিত এই মন্তব্য প্রকাশ করেও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন :

> যা হোক, তবুও এ বিষয়ে তাঁহার প্রচেষ্টা পরবর্তী অনুসন্ধানকারীদের পথনির্দেশ করিয়াছে; তিনিই পথিকৃৎ, সেইজন্য তিনি সর্বতোভাবে প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই।[১৩৮]

লালনগীতি সংগ্রহের পাশাপাশি তিনি লালনের জীবন ও সঙ্গীত সম্পর্কেও মূল্যবান আলোচনা করেছেন এবং অনেক নতুন তথ্যের সন্ধানও দিয়েছেন।

দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬-১৯৩৯) আশীর্বাদ ও আনুকূল্যে কবি জসীমউদ্‌দীনের (১৯০৩—১৯৭৬) সংগ্রাহক-জীবনের সূচনা। লোক-গাথা বা গীতিকার পাশাপাশি তিনি বাউল-মুর্শিদি-মারফতি-জারি প্রভৃতি লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করেন। ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে 'লালন-

ফকির' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথম যুগের লালনচর্চার নিদর্শন হিসেবে প্রবন্ধটির একটি বিশেষ মূল্য আছে।

বাউলধর্মের তত্ত্ব, দর্শন ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং লালনসহ বাঙলার প্রধান বাউলসাধকদের জীবনী ও পদসংগ্রহ প্রকাশের ক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউলগান' (১৩৬৪) একটি মূল্যবান কোষ-গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। উপেন্দ্রনাথ ১৯২৫ সাল থেকে লালনের গান সংগ্রহ শুরু করেন। এরপর ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে শিলাইদহে অনুষ্ঠিত 'নিখিলবঙ্গ পল্লীসাহিত্য সম্মেলন' উপলক্ষে তিনি লালনপন্থী ফকির-দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগলাভ করেন এবং বেশকিছু লালনগীতি সংগ্রহ করেন। 'বাংলার বাউল ও বাউলগান' গ্রন্থে লালনের জীবনীসহ নির্বাচিত ১৬০টি গান প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় সংস্করণে আরো ৫০টি গান যুক্ত হয়। বাংলার বাউল সম্পর্কিত সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির জন্য উপেন্দ্রনাথ ১৯৫৮ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন এবং একই সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. ফিল. উপাধিতে ভূষিত করে।

লালনের গান সংগ্রহে মতিলাল দাশের ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫/৩৬ সালে কুষ্টিয়ার মুন্সেফ থাকাকালীন তিনি ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় রক্ষিত লালনের গানের খাতা থেকে ৩৭১টি গান সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহ-কাজে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট আইনজীবী ও 'দীপিকা' পত্রিকার পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বসুমতী' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩৪১) 'লালন ফকিরের গান' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মতিলাল দাশের সংগ্রহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-সংগৃহীত কিছু গান একত্রিত করে ১৯৫৮ সালে 'লালনগীতিকা' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

লালনচর্চায় শচীন্দ্রনাথ অধিকারী স্মরণীয় হয়ে আছেন বিতর্কিত রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকার কাহিনী প্রচারের জন্য। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ-জীবনের ভাষ্যকার শচীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতিচর্চায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। শিলাইদহে অনুষ্ঠিত 'নিখিলবঙ্গ পল্লীসাহিত্য সম্মেলনে'র তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা ও অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক। শচীন্দ্রনাথ লালন শাহ, গগন হরকরা, গোঁসাই গোপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী প্রমুখ সাধক-সাধিকা

সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে প্রবন্ধাদি রচনা করেন এবং উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে বিশেষ সহযোগিতা করেন। তিনি লালন-জীবনীভিত্তিক একটি নাটক রচনা করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে লালন সম্পর্কে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন।

লোকসংস্কৃতি এবং বাউল ও লালন-অনুরাগী অন্নদাশঙ্কর রায় তিরিশের দশকে কুষ্টিয়ার মহকুমা প্রশাসক ছিলেন। এই সময়ে লালন-প্রসঙ্গে তিনি 'হারামণি'র সংগ্রাহক মনসুরউদ্দীনকে বিশেষ সাহায্য-সহযোগিতা করেন। অন্নদাশঙ্করের অনেক লেখাতেও বাউল পদাবলী ও লালন সম্পর্কে আগ্রহ ও অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি'র সমালোচনাতেও ('প্রবন্ধ', কলিকাতা, ১৯৬৪) তাঁর লোকসাহিত্য ও বাউলপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'লালন ফকিরের আস্তানা' আর 'বাউলদের মিলনকেন্দ্র' কুষ্টিয়ায় অবসরজীবনে 'সাহিত্যসাধনার আসন' পাতার আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করতেন তিনি।[৩৯] মূলত তাঁরই উদ্যোগে কলকাতায় লালনের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়। এরপর 'লালন ও তাঁর গান' (১৩৮৫) নামে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সম্প্রদায়-সম্প্রীতির প্রবক্তা-প্রয়াসী মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন এই মানবতাবাদী শিল্পী লালনের সঙ্গীত-বাণীতে তাঁর জীবনচেতনার স্পন্দন অনুভব করেছেন বলে সাধককবির মূল্যায়নে তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। অন্নদাশঙ্কর-পত্নী লীলা রায়ও বাউল-প্রসঙ্গে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি ক্ষিতিমোহন সেনের 'বাংলার বাউল' গ্রন্থটির ইংরেজি-অনুবাদ করেন, যা 'The Bauls of Bengal' নামে 'Visvabharati Quarterly'-তে প্রকাশিত হয়।

বাঙলাদেশে যাঁরা লালনচর্চার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের মধ্যে আনোয়ারুল করীমের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বাউল কবি লালন শাহ' বাঙলাভাষার রচিত লালন-সম্পর্কিত দ্বিতীয় গ্রন্থ এবং বর্তমান বাঙলাদেশ ভূখণ্ডে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। বাউল ও লালন সম্পর্কে ইংরেজি ও বাঙলাভাষায় রচিত তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ: 'ফকির লালন শাহ' (১৩৮২), 'The Bauls of Bangladesh' (১৯৮০), 'লালনের গান' (১৯৮৪)। ১৯৬৬ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় লালনের গানের সংকলন 'লালনগীতি'। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লালন সম্পর্কে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যাও কম নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সহযোগে 'হারামণি' ৫ম খণ্ড (১৩৬৮) সম্পাদনা করেন। তাঁর 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (১৯৬৫) গ্রন্থে 'লালন শাহ ফকির' নামে একটি প্রবন্ধ আছে। তাঁরই আগ্রহ ও আনুকূল্যে 'সাহিত্য পত্রিকা'য় (বর্ষা ১৩৬৫) মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-সংগৃহীত লালনের ২৯৭টি গান প্রকাশিত হয়।

মুহম্মদ আবু তালিব দীর্ঘকাল ধরে লালনচর্চার সঙ্গে যুক্ত। সংখ্যার বিচারে তিনিই বোধহয় লালন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এ-যাবত লালন সম্পর্কে তাঁর দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে: 'লালন শাহ ও লালনগীতিকা' (২ খণ্ড: ১৯৬৮) ও 'লালন পরিচিতি' (১৯৬৮)।

সনৎকুমার মিত্রের 'লালন ফকির: কবি ও কাব্য' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৮৬ সালে। এই গ্রন্থে তিনি লালনের জীবনী ও গান নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের ২৮৫টি গান মূল খাতার বানান অনুসারে তিনি প্রকাশ করেছেন। এটি একটি মূল্যবান সংযোজন। এই গ্রন্থে তিনি লালন-সম্পর্কিত কয়েকটি বিতর্কের সমাধান নির্দেশ করেছেন এবং নিজেও নতুন বিতর্কের অবতারণা করেছেন। এই গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ স্মৃতি-পুরস্কারে সম্মানিত।

আহমদ শরীফ বাংলার তত্ত্বসাহিত্য নিয়ে মূল্যবান কাজ করেছেন। বাউলধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের আলোচনার পাশাপাশি লালন সম্পর্কেও তাঁর মনোযোগ প্রসারিত হয়েছে। 'লালন শাহ' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রথমে 'পূবালী' (আশ্বিন ১৩৬৭) পত্রিকায় প্রকাশিত ও পরে তাঁর 'বিচিত চিন্তা' (১৯৬৮) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর 'বাউলতত্ত্ব' (১৯৭৩) গ্রন্থটি বাউল-সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে একটি আকর গ্রন্থ।

খোন্দকার রিয়াজুল হক লালনজীবনী অনুসন্ধান ও লালনগীতি সংগ্রহে দীর্ঘকাল নিয়োজিত আছেন। লালন সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বাউল ও লালন সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থের নাম 'লালন শাহের পুণ্যভূমি: হরিশপুর (১৯৭২)। সম্পাদিত গ্রন্থ 'লালন-সাহিত্য ও দর্শন' (১৯৭৬)। সম্প্রতি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে লালনের গানের একটি সংকলন 'লালনসংগীত চয়ন' (১৯৮৯)।

দুই দশকেরও অধিককাল ধরে এস.এম. লুৎফর রহমানের লালন-সম্পর্কিত প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় পত্রস্থ হলেও এ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যথেষ্ট বিলম্বে। তাঁর 'লালন শাহ—জীবন ও গান' এবং 'লালন-জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালে। তাঁর সম্পাদিত 'লালন-গীতি চয়ন' (১ম খণ্ড)-র প্রকাশকাল ১৯৮৫।

এছাড়া লালন সম্পর্কে গ্রন্থ-রচয়িতারা হলেন: এ.এইচ.এম. ইমাম-উদ্দীন ('বাউল মতবাদ ও ইসলাম': ১৯৬৯), আবুল আহসান চৌধুরী ('কুষ্টিয়ার বাউলসাধক': ১৯৭৪ ও 'লালন স্মারকগ্রন্থ': সম্পা. ১৯৭৪), সুবোধ চক্রবর্তী ('বাঙলার বাউল লালন ফকির': ১৩৮৩), তুষার চট্টোপাধ্যায় ('লালন স্মরণিকা' সম্পা. ১৯৭৬), ম. মনিরউজ্জামান ('লালন-জীবনী ও সমস্যা': ১৯৭৮ ও 'লালন ফকীরের গান' : সম্পা. ১৩৯৩), শান্তিময় ঘোষাল('লালন ফকির': ১৩৯৩), তৃপ্তি ব্রহ্ম ('লালন পরিক্রমা': ১৩৯৩)।

বাউল ও লালনচর্চায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী মোতাহার হোসেন, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আশুতোষ ভট্টাচার্য, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, খোন্দকার রফীউদ্দীন, আবদুল লতীফ আফী আনহু, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, রণজিৎকুমার সেন, আশরাফ সিদ্দিকী, চিত্তরঞ্জন দেব, ওয়াকিল আহমদ, মোহাম্মদ শরীফ হোসেন, মোহিত রায়, হাতেম আলী মোল্লাহ, মোমেন চৌধুরী, আবু জাফরের নামও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

লালন-গবেষণা ও লালনগীতি সংগ্রহ-সংরক্ষণ-প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালে ছেঁউরিয়ায় লালনের আখড়াকে কেন্দ্র করে 'লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানের নতুন নাম হয় 'লালন একাডেমী'। কিন্তু এই একাডেমীর কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠালগ্নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়নি। লালনপন্থী বাউলদের সংগঠিত করে লালনের সাধনা ও সঙ্গীত প্রচারের জন্য ছেঁউড়িয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'লালন মাজার শরীফ ও সেবাসদন'। লালনচর্চার জন্য ঢাকায় গঠিত হয়েছে 'লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ'। এই সংগঠন একটি অনিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। লালনগীতির স্বরলিপির প্রকাশনা এঁদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য

কাজ। কুষ্টিয়ার 'ফোকলোর রিসার্চ ইংসটিটিউট' (১৯৭০) লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার পাশাপাশি লালন-গবেষণাতেও মনোযোগী। এ-সম্পর্কে এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি প্রকাশনাও আছে।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে লালনচর্চায় বাংলা একাডেমীর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে মুহম্মদ আবু তালিবের দুই খণ্ডে 'লালন শাহ ও লালনগীতিকা (১৯৬৮), আবু রুশদ-কৃত লালনের গানের ইংরেজি তর্জমা 'Songs of Lalan Shah (১৯৬৪)', মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি'র বেশ কয়েকটি খণ্ড। প্রকাশ-অপেক্ষায় আছে মো: সোলায়মান আলী সরকারের গ্রন্থ 'লালন শাহের মরমী দর্শন'। 'Bangla Academy Journal'-এ প্রকাশিত হয়েছে মনসুরউদ্দীন-অনূদিত লালনের গান। একাডেমীর 'লোকসাহিত্য' নামীয় সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে লালনের বেশ কিছু গান। ফোকলোর বিভাগের উদ্যোগে সংগৃহীত হয়েছে কয়েকশত লালনগীতি।

লালনের গান প্রচারে রেডিও ও টেলিভিশনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রয়াত শিল্পী মকসেদ আলী সাঁইয়ের (১৯৩৩—১৯৮১) উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে রেডিও বাংলাদেশের ট্রান্সক্রিপসন সার্ভিস লালন-ঘরানার প্রবীণ শিল্পী বেহাল শাহ, ঝড়ু শাহ, মহেন্দ্র শাহ, কানাই ক্ষ্যাপা, গোলাম ইয়াসিন শাহ, খোদাবক্স শাহ, স্বরূপ শাহ, মকসদ আলী সাঁই, জমিলা ফকিরানী প্রমুখের বেশকিছু গান রেকর্ড করে রেখেছে।

মকসেদ আলী সাঁইয়ের গাওয়া দু'টি গান নিয়ে ('যেখানে সাঁইর বারামখানা' ও 'গৌরপ্রেম করবি যদি ও নাগরি') লালনগীতির প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হয় মুক্তিযুদ্ধের শেষপ্রান্তে ১৯৭১ সালে কলকাতার হিজ মাস্টার্স ভয়েসের উদ্যোগে। হিজ মাস্টার্স ভয়েসের ব্যবস্থাপনায় পরবর্তীতে মঞ্জু দাশ (১৯৭২), প্রহলাদ ব্রহ্মচারী ও অমর পালের (১৩৮১) রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৮২ সালে ঐ একই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে লালনের দ্বিশত জন্মবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে 'অবিস্মরণীয় লালন' নামে লালনগীতির একটি লং-প্লে রেকর্ড প্রকাশিত হয়। এরপর ঢাকা থেকে বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড জানুয়ারী ১৯৮০ আবু জাফরের পরিচালনায় ফরিদা পারভীনের (জ. ১৯৫৪) কণ্ঠে লালনের চারটি গানের

একটি রেকর্ড বের করেন। 'মনের মানুষ যেখানে' নামে ফরিদা পারভীনের লালনগীতির লং-প্লে রেকর্ডও প্রকাশিত হয়েছে 'শ্রোতার আসরে'র পক্ষ থেকে (ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪)।[১৪০] ঢাকার ডন টেপ ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় ১৯৮৬ সালে ফরিদা পারভীনের লালনগীতির ক্যাসেটও বেরিয়েছে। অন্যান্য শিল্পীদের ক্যাসেটও প্রকাশিত হয়েছে। আখড়াই-ঘরানার বাইরে ফরিদা পারভীনই লালনগীতির সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী;—লালনের গান বহির্বিশ্বে প্রচার ও পরিচিত করার কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য।

লালনগীতির স্বরলিপি প্রণয়নের জন্য মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বিভিন্ন সময়ে তাগিদ দিয়েছেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল-গানে' লালনের একটি গানের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছে। মকসেদ আলী সাঁই লালনের বেশ কিছু গানের স্বরলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর-কৃত কিছু স্বরলিপি 'বেতার বাংলা'য় প্রকাশিত হয় এবং সনৎকুমার মিত্রের 'লালন ফকির : কবি ও কাব্য' গ্রন্থে একটি স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছে। "পাক্ষিক একটি সংকলনের মাধ্যমে একশত গানের সম্ভাব্য সঠিক পাঠ, স্বর ও পরিবেশন সংক্রান্ত গবেষণা-লিপিপত্র প্রকাশ" করার পরিকল্পনা মকসেদ সাঁইয়ের ছিলো।[১৪১] কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুর ফলে এই প্রত্যাশিত কাজটি সম্পন্ন হতে পারেনি। কাজী নাসির (জ. ১৯৪১) প্রকাশ করেছেন 'লালন সংগীত স্বরলিপি' (১৯৮১)। খোদাবক্স শাহের সহায়তা সুধীন দাশ-কৃত ২৫টি গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে লালন সংগীত স্বরলিপি' (১৩৯২) নামে। সুরাইয়া খলিলের নজরুলগীতির স্বরলিপি-গ্রন্থ 'নজরুল সুর সুধা'র (১ম খণ্ড: ঢাকা ১৯৬৮) শেষ প্রচ্ছদে 'লেখিকার পরবর্তী প্রকাশনী'-রূপে লালনগীতির স্বরলিপি 'লালন সুর-মালা' (১ম খণ্ড)-র বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হলেও শেষপর্যন্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি।

মঞ্চ, বেতার ও টেলিভিশনে লালন ফকিরের জীবনের নাট্যরূপ পরিবেশিত হয়েছে। আসকার ইবনে শাইখের 'লালন ফকীর' (১৯৬৯), দেবেন্দ্রনাথ নাথের 'সাঁই সিরাজ বা লালন ফকির' (১৩৭৯), কল্যাণ মিত্রের 'লালন ফকির' (১৯৭৭) লালনের জীবনীভিত্তিক নাটক। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট যাত্রা-প্রতিষ্ঠান 'নট্ট কোম্পানী' দেবেন্দ্রনাথের 'লালন ফকির' ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত ১৫০ রজনীর অভিনয় সম্পন্ন করেন।[১৪২] মন্মথ রায় লালন সম্পর্কে দু'টি নাটক রচনা করেন : 'লালনামৃত' ও 'লালন

ফকির'। তাঁর 'লালন ফকির' নাটকটি সবিতাব্রত দত্তের নির্দেশনা ও 'রূপকারে'র প্রযোজনায় ১৯৭০ সালের ৩ জুন কলিকাতার কলামন্দির মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। প্রধান ভূমিকায় ছিলেণ তৃপ্তি মিত্র, গীতা দত্ত ও সবিতাব্রত দত্ত 'রূপকার' পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও জামশেদপুর, বেনারস, বোম্বে প্রভৃতি স্থানে এই নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে।[১৪৩] রণজিৎকুমার সেনের 'বাউলরাজা' উপন্যাসটির নাট্যরূপ, 'লালন ফকির' কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে একাধিকবার প্রচারিত হয়। 'বাউলরাজা'র বেতার-নাট্যরূপ দেন দিগীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিচালিনা করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। নামভূমিকায় অভিনয় করেন রবীন মজুমদার। 'বাউলরাজা'র নাট্যরূপ বলাই সেনের পরিচালনায় নিউ এম্পায়ার ও অন্যত্রও অভিনীত হয়।[১৪৪] বাঙলা দেশে লালনকে নিয়ে একটি চলচিচত্রও নির্মিত হয়েছে সৈয়দ হাসান ইমামের পরিচালনায় 'লালন ফকির' (১৯৭০?) নামে। পশ্চিমবঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায় লালন সম্পর্কে একটি চলচিচত্র-নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, কিন্তু তা সমাপ্ত হতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গে লালন-সম্পর্কিত পুতুলনাচের পালা বিশেষ জনপ্রিয়। এ-সম্পর্কে নদীয়ার জন-ইতিহাস রচয়িতা মোহিত রায় জানিয়েছেন:

> লালন সম্পর্কে...আছে পুতুলনাচেরও পালা। বিশেষ করে, নদীয়ার পুতুলনাচের দলের 'লালন ফকির' খুবই জনপ্রিয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে রচিত। সরকারী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) পোষকতায় 'লালন ফকির' পুতুলনাচের পালা ব্যাপকভাবে নানাস্থানে সারা বছর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নাট্যকার-যাত্রাকার ব্রজেন্দ্রনাথ দে রচিত 'লালন ফকির' যাত্রাপালার সম্পাদিত পালাই নদীয়ার 'লালন ফকির' পুতুলনাচের পালায় পরিবেশিত হয়ে থাকে।[১৪৫]

লালন সম্পর্ক এ্যাকাডেমিক গবেষণাও হচ্ছে দেশে-বিদেশে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউলগান' গ্রন্থের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে 'ডি.ফিল.' উপাধি লাভ করেন। আনোয়ারুল করীম প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিমের তত্ত্বাবধানে 'বাউল: একটি অধ্যাত্মবাদী সাধনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পি-এইচ.ডি.' ডিগ্রি (১৯৭৭) লাভ করেন। এস. এম. লুৎফর

রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পি-এইচ.ডি.' ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৭৯ সালে। তাঁর অভিসন্দর্ভের নাম 'বাউলসাধনা ও লালন শাহ'; গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রফেসর আহমদ শরীফ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পি.এইচ.ডি.' ডিগ্রি অর্জনকারী পলাশ মিত্রের গবেষণার বিষয়ও ছিলো লালন শাহ। 'লালন শাহের মরমী দর্শন' ('The Mystic Philosophy of Lalan Shah') শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৪ সালে 'পি-এইচ.ডি.' ডিগ্রি পেয়েছেন মোঃ সোলায়মান আলী সরকার (জ. ১৯৪০)। তাঁর গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রফেসর মাহমুদ শাহ কোরেশী।[১৪৬] মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনকে তাঁর লোক সংস্কৃতি-চর্চায় অসমান্য কৃতিত্বের জন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক 'ডি.লিট.' (৪ মে ১৯৮৭) উপাধি প্রদান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মনসুরউদ্দিনের লোকসংস্কৃতিচর্চার প্রধান অনুষঙ্গই ছিলো লালন ফকির।

১৯৭৪ সালে লালন দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয় বাঙলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে। ইতোপূর্বে রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত অপর কোনো বাঙালী মনীষীর জন্মের দ্বিশত-বর্ষ উদযাপিত হয়নি। এই উপলক্ষে বাঙলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে আবুল আহসান চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'লালন স্মারকগ্রন্থ' (চৈত্র ১৩৮০ / মার্চ ১৯৭৪)। পশ্চিম-বঙ্গের চাকদহ কলেজ (নদীয়া) থেকে প্রকাশিত 'লালন স্মরণিকা' (১৯৭৬) সম্পাদনা করেন তুষার চট্টোপাধ্যায়। লালন দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সেমিনারের আয়োজন করে কুষ্টিয়া সাহিত্য পরিষদ (১৭ অক্টোবর ১৯৭৪), বাঙলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র (৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪), লালন, লোকসাহিত্য কেন্দ্র (২২---২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৪), বাঙলাদেশ পরিষদ (ঢাকা কেন্দ্র)। ১৯৭৬ সালে বাংলা একাডেমীর ভাষা আন্দোলনের স্মারক-দিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার পঞ্চম দিবসে (১৯ ফেব্রুয়ারী) 'ভাষা ও লোকসাহিত্য' বিষয়ক সেমিনারটি 'লালন শাহের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপ-লক্ষে নিবেদিত' হয়।[১৪৭]

অন্নদাশঙ্কর রায়, রণজিৎকুমার সেন প্রমুখের আগ্রহ ও উদ্যোগে পশ্চিম-বঙ্গে লালন দ্বিশতবার্ষিকী উদযাপনের ব্যবস্থা হয়। পশ্চিমবঙ্গে লালন-স্মরণে যে-সব অনুষ্ঠান হয় তারমধ্যে কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় দোলমেলার আলোচনাসভা (৮ মার্চ ১৯৭৪), 'গান্ধর্বী' সঙ্গীতনিকেতন (১৩ অক্টোবর

১৯৭৪), বাংলা সাহিত্য একাডেমী-ভারতীয় সংস্কৃতিভবন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে আয়োজিত সেমিনার (৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫), সত্যধর্মসেবক সঙ্ঘ (৪ মে ১৯৭৫), গ্রামীণ গীতি সংস্থা (সেপ্টেম্বর ১৯৭৫), একাডেমী অব ফোকলোর (২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬) আয়োজিত আলোচনা-অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখযোগ্য।[১৪৮] লালন দ্বিশত জন্মবর্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ ও অনুষ্ঠানসমূহ লালন সম্পর্কে নতুন করে সুধীসমাজে আগ্রহ ও কৌতূহল সঞ্চারিত করে এবং লালন-চর্চায় উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। দ্বিশত জন্মবর্ষের পরে লালনচর্চার তথ্য-পরিসংখ্যান সংগ্রহ করলে এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে।

লালনকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করার জন্য বাঙলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজিভাষায় কিছু কিছু কাজ হয়েছে। এরমধ্যে প্রথমেই লালনের গানের ভাষান্তরের কথা উল্লেখ করতে হয়। আবু রুশদ কৃত লালনের ৬০টি গানের অনুবাদ 'Songs of Lalon shah' (১৯৬৬) নামে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির প্রাক্তন অধ্যাপিকা Miss. A. G. Stock লালনগীতির ইংরজি-অনুবাদ করেন এবং তা Indian P. E. N. পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন লালনের বেশকিছু গানের তর্জমা ('Folk-songs of Lalon Shah') করেন এবং তা Bangla Academy Journal-এ (April–December 1978) প্রকাশিত হয়। ম. মীজানুর রহমান ২৫টি লালনের গানের অনুবাদ করেছেন 'Myriad Miracle—Lalon's Song' (জানুয়ারী ১৯৮৭) নামে। Brother James-এর অনুবাদও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে, 'Songs of Lalon' (১৯৮৭)। 'The Bauls of Bengal নামে ক্ষিতিমোহন সেনের 'বাংলার বাউলের'র লীলা রায়-কৃত অনুবাদ Visvabharati Quarterly-তে ছাপা হয়। Z. A. Tufayell লিখিত 'Lalon Shah and Lyrics of the Padma' (১৯৬৮) গ্রন্থে অন্যান্য রচনার সঙ্গে লালন সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাউল ও লালন সম্পর্কিত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে আনোয়ারুল করীমের' 'The Bauls of Bangladesh' (১৯৮০) গ্রন্থে। এ-বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থ : Deben Bhattacharya অনূদিত 'The Mirror of the Sky' (1969), Alokeranjan Dasgupta ও Mary Ann Dasgupta-র 'The roots in the void : Bauls of Bengal' (1977), Sarat Chandra, Chakravarty-র 'Bauls : The Spiritual Vikings' (1980), Sri Anirvan-এর 'Letters from a Baul : Life

within Life. (1983)। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Bauls of Bengal' (1987)।[১৪৯] আবু জাফরের সহায়তায় বাঙলাদেশে ভারতের প্রাক্তন হাইকমিশনার মুচকুন্দ দুবে লালনের বেশকিছু গান হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন।[১৫০]

কেবল বাঙলাভাষা-ভাষী অঞ্চল নয় বিদেশও বাউল ও লালন সম্পর্কে ক্রমশ আগ্রহ ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাঙলার লোকসংস্কৃতি ও বাউল সম্পর্কে বিদেশে অনেকে কাজ করেছেন ও করছেন। এঁদের মধ্যে Dusan Zbavitel-এর নাম প্রথমেই স্মরণ করতে হয়। Edward C. Dimock-এর 'The Place of ths Hidden Moon' (Chicago, 1966) বৈষ্ণব-সহজিয়া ও বাউল-বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি প্রকাশিত June Mcdaniel-এর 'The Madness of the Saints' (Chicago, 1989) গ্রন্থটির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। বাউল ও লালন শাহ সম্পর্কে গবেষণা কারীদের মধ্যে Charles H. Capwell, Josef Kuckertz, Carrol Salomon, Masayuki O'Onishi প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার মিস মীরা বীনফোর্ড লালন সম্পর্কে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য ১৯৭৩ সালে ছেঁউড়িয়ায় এসেছিলেন। পশ্চিম জার্মানীর বিশিষ্ট সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ ম্যাক্সিন উইনিয়স ছেঁউড়িয়ায় এসে লালনের অনেক গান রেকর্ড করেন। লালনের এই গানগুলো বিশ্বের বিভিন্ন ফোক-মিউজিক মিউজিয়ামে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। উইনিয়স এই গানের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন 'আত্মনিবেদনের আকুলতা'।[১৫১]

কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' (আগষ্ট ১৯৭২) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রায় একশো কুড়ি বছর ধরে লালনচর্চা অব্যাহত রয়েছে। লালনচর্চার এই দীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা-দানের জন্য এখানে লালন-সম্পর্কিত বাঙলা-ইংরেজি গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, লালন-স্মারণিকা, লালনজীবনী-কেন্দ্রিক গল্প-কবিতা-নাটক-উপন্যাস-চলচ্চিত্র, লালনের প্রতিকৃতি, লালনগীতির গ্রামোফোন রেকর্ডের একটি যথাসম্ভব বিস্তৃত ও প্রায় পূর্ণাঙ্গ তালিকা পেশ করা হলো।[১৫২] লালন ব্যতীত বাউল-সম্পর্কিত কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধও এই তালিকায় সংযোজিত হয়েছে। এই সংযোজনের উদ্দেশ্য হলো এইসমস্ত গ্রন্থ বা প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে লালন সম্পর্কে অলোকপাত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ-গুলো পরিপূরক রচনা।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লালন-সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ

১. 'হিতকরী' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ (রাইচরণ দাস লিখিত): "মহাত্মা লালন ফকীর"। ১ম বর্ষ ১৩শ সংখ্যা। ৩১ অক্টোবর ১৮৯০: ১৫ কার্তিক ১২৯৭।
২. শ্রীমতী সরলা দেবী: "লালন ফকির ও গগন"। 'ভারতী': ভাদ্র ১৩০২।
৩. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত: "পল্লীসঙ্গীতে ভক্তকবি ফকির লালন সা"। "প্রবাসী': চৈত্র ১৩৩১।
৪. বসন্তকুমার পাল: "ফকির লালন শাহ"। 'প্রবাসী': শ্রাবণ ১৩৩২।
৫. (কবি) জসীমউদদীন: "লালন ফকির"। 'বঙ্গবাণী': শ্রাবণ ১৩৩৩।
৬. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন: "শাহ লালন ফকির" 'বঙ্গবাণী': অগ্রহায়ণ ১৩৩৩।
৭. বসন্তকুমার পাল: "লালন শাহ"। 'প্রবাসী': বৈশাখ ১৩৩৫।
৮. মুন্সী মুহম্মদ জসীমউদ্দীন: "লালন ফকিরের গান"। 'উদয়ন': ১৯৩২।
৯. নীলরতন মজুমদার: "ফকির লালন সাঁই"। 'দীপিকা': ৪, ১৫, ৩২ আষাঢ় ১৩৩৯।
১০. কবি মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর): "ফকীর লালন শাহ"। 'দীপিকা': ২৬ ভাদ্র ১৩৪১।
১১. মতিলাল দাশ: "লালন ফকিরের গান"। 'বসুমতী': শ্রাবণ ১৩৪১।
১২. শ্রীসাহাজী (রাধাবিনোদ সাহা): "লালন ফকির" (২য় প্রস্তাব)। 'দীপিকা': ১২ জুন ১৯৩৫।
১৩. তারাপদ দাশ: "নদীয়া জেলার কয়েকজন সমন্বয়পন্থী সাধক"। 'ভারতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩।
১৪. এ.কে.এস্. নূর মোহাম্মদ: "লালন ফকির হিন্দু না মুসলমান?"। 'মাসিক মোহাম্মদী': আষাঢ় ১৩৪৮।

১৫. বিশ্বনাথ মজুমদার : "লালন ফকির"। 'আনন্দবাজার পত্রিকা': ২৯ এপ্রিল ১৯৪১।

১৬. অনিলকুমার চৌধুরী : "লালন ফকিরের গান"। 'দেশ' : ২ পৌষ ১৩৫০।

১৭. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী : "কবি-মিলন" [রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকার]। 'প্রবর্ত্তক' : বৈশাখ ১৩৫১।

১৮. মুহম্মদ আবু তালিব : "সাধক কবি লালন শাহ"। বৈশাখ ১৩৫৮।

১৯. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : "লালন ফকিরের গান"। 'মোহাম্মদী' : আষাঢ় ১৩৬২।

২০. জয়দেব রায়: "লালন ফকিরের গান"। 'ভারতবর্ষ' : ফাল্গুন ১৩৬৩।

২১. আমিনুদ্দীন শাহ : "সাধক কবি লালন শাহ"। 'দৈনিক ইত্তেফাক' : ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫।

২২. রিয়াজউদ্দীন : "সাধক কবি লালন শাহ"। 'পাক-সমাচার': ৫ এপ্রিল ১৯৫৮।

২৩. এ.এস.এম. আনোয়ারুল করীম : "বাউল কবি লালন শাহ"।'দৈনিক ইত্তেফাক' : ২১ বৈশাখ ১৩৬৫।

২৪. খোন্দকার রিয়াজুল হক : "লালন ফকিরের গান"। 'দিলরুবা' : পৌষ ১৩৬৫।

২৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : "মদন বাউল ও লালন শাহের কাব্যে আত্ম-নিবেদনের সুর"। 'সমকাল' : ভাদ্র ১৩৬৬।

২৬. রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী : "লালন শাহের গান"। 'দৈনিক ইত্তে-ফাক' : ৮ শ্রাবণ ১৩৬৭।

২৭. আহমদ শরীফ : "লালন শাহ"। 'পূবালী' : আশ্বিন ১৩৬৭।

২৮. মোহাম্মদ শরীফ হোসেন : "লালন শাহের জন্মস্থান"। 'দৈনিক ইত্তেফাক' : ৮ মাঘ ১৩৬৭।

২৯. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : "লালন শাহ ফকীর"। 'দৈনিক ইত্তেফাক' : ২১ ফাল্গুন ১৩৬৭।

৩০. এ.এস.এম. আনোয়ারুল করীম : "বাউল কবি লালন শাহ"। 'লেখক সংঘ পত্রিকা' : ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৬৮।

৩১. মহীউদ্দীন: "সঙ্গীতে লালন ফকিরের দান"। 'অতএব': জানুয়ারী ১৯৬৩।
৩২. মুহম্মদ আবু তালিব: "লালন শাহ ও লালনগীতির পুনর্বিচার"। 'পরিক্রম': ফাল্গুন ১৩৭১।
৩৩. আনোয়ারুল করীম: "লালন গীতিকায় সুফীবাদের প্রভাব"। 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা': বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৭২।
৩৫. আফসারউদ্দীন শেখ: 'লালন জীবন-জিজ্ঞাসার এক অধ্যায়'। 'কুষ্টিয়া কলেজ বার্ষিকী': ১৯৬৪-৬৫।
৩৬. মুহম্মদ আবু তালিব: "লালন শাহ: মত ও পথ"। 'সাহিত্যিকী': শরৎ-বসন্ত ১৩৭৩।
৩৭. এস.এম. লুৎফর রহমান: "লালন শাহের জীবন-কথা"। 'সাহিত্য পত্রিকা': বর্ষা ১৩৭৪।
৩৮. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন: "লালন শাহের আধ্যাত্মিক বিকাশ"। 'এলান': এপ্রিল ২য় পক্ষ ১৯৬৭।
৩৯. মানস মজুমদার: "অচিন পাখির সন্ধানী: লালন ফকির"। 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা': ২১ আশ্বিন ১৩৭৪।
৪০. এ. এইচ. এম. ইমামউদ্দীন: "বাউল মতবাদ ও ইসলাম"। 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা': কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪।
৪১. হাতেম আলী মোল্লাহ: "মরমী কবি লালন শাহ"। 'কাফেলা': শ্রাবণ ১৩৭৫।
৪২. এস. এম. লুৎফর রহমান: "বাউল মতবাদ ও লালন শাহ"। 'সমকাল': অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩৭৫।
৪৩. সিদ্দিকুর রহমান: "বাউল মতবাদ ও লালন শাহ"। 'মাহেনও': বৈশাখ ১৩৭৬।
৪৪. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন: "বাউল গান ও লালন শাহ"। 'পূর্বদেশ': ১৮ মাঘ ১৩৭৬।
৪৫. মুহম্মদ আবু তালিব: "লালন শাহ ও লালনগীতির গোড়ার কথা"। 'বাঙলা উন্নয়ন-বোর্ড পত্রিকা': শরৎ ১৩৭৭।
৪৬. মোহাম্মদ গোলাম রসুল: 'লালন-গীতিকার মর্মকথা"। 'মাহেনও': কার্তিক ১৩৭৮।

৪৭. মোহিত রায়: "লালন সাঁই-এর মাজারে"। সাপ্তাহিক 'অমৃত': ২৮ আশ্বিন ১৩৭৮ (১৫ অক্টোবর ১৯৭১)।
৪৮. সুরাইয়া খলিল: "লালন, রবীন্দ্র ও নজরুল প্রসঙ্গে"। 'দৈনিক গণকণ্ঠ': ২২ আশ্বিন ১৩৭৯।
৪৯. সুফী গোলাম মহীউদ্দীন: "মরমী কবি লালন শাহ"। 'দৈনিক পূর্বদেশ': ৫ কার্তিক ১৩৭৯।
৫০. রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী: "রবীন্দ্রনাথের লালনচর্চা"। 'দৈনিক বাংলা': ২৯ মাঘ ১৩৭৯।
৫১. রাজিয়া বেগম: "মরমী কবি লালন শাহ"। 'দৈনিক বাংলা': ৮ কার্তিক ১৩৭৯।
৫২. মুহম্মদ সিরাজউদ্দিন: "লালনতত্ত্বের ভূমিকা"। 'লোক-ঐতিহ্য' (কুষ্টিয়া): জ্যৈষ্ঠ-ফাল্গুন ১৩৮০।
৫৩. আবুল আহসান চৌধুরী: "লালনচর্চার ইতিকথা"। 'দৈনিক বাংলা': ২৭ আশ্বিন ১৩৮০।
৫৪. হারানচন্দ্র সরদার: "বাংলার সাধনায় লালন ফকির"। 'আর্য্যদর্পণ': ১৯৭৩ (ধারাবাহিক প্রকাশিত)।
৫৫. আবুল আহসান চৌধুরী: "লালন ফকির: মঞ্চ, বেতার ও চলচ্চিত্রে"। 'সাপ্তাহিক সিনেমা': ১৭ আশ্বিন ১৩৮০।
৫৬. মুহম্মদ আবু তালিব: "লালনের কবিত্ব"। 'দৈনিক ইত্তেফাক': ২৭ আশ্বিন ১৩৮০।
৫৭. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ: "লালন শাহ ও আত্মদর্শন"। 'দর্শন': পৌষ ১৩৮০।
৫৮. ওয়াকিল আহমদ: "লালন শাহের কবিমানস ও কাব্য-মূল্যায়ন"। 'সওগাত': পৌষ ১৩৮০।
৫৯. আনোয়ারুল করীম: "লালন সম্পর্কে নতুন তথ্য"। 'সাপ্তাহিক চিত্রালী': ১৩ জুলাই ১৯৭৩।
৬০. আবুল আহসান চৌধুরী: "লালন সম্পর্কে নতুন তথ্য' প্রসঙ্গে"। 'সাপ্তাহিক চিত্রালী': ৩ আগষ্ট ১৯৭৩।
৬২. খোন্দকার রিয়াজুল হক: "লালন শাহ প্রসঙ্গে"। 'দৈনিক পূর্বদেশ': ২১ বৈশাখ ১৩৮১।

৬৩. অন্নদাশঙ্কর রায়: "লালন দ্বিশত বার্ষিকী"। 'আনন্দবাজার পত্রিকা': শারদীয়া ১৩৮১।
৬৪. রণজিৎকুমার সেন: "লালন দ্বিশত জন্মজয়ন্তী"। 'বিশ্ববাণী': শারদীয়া ১৩৮১।
৬৫. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়: "লালন ফকির"। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা': শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৮১।
৬৬. গিরীন্দ্রনাথ দাস: "লালন ফকির"। 'মূল্যায়ন': ১৩৮১ (১০ম বর্ষ ৪র্থ খণ্ড)।
৬৭. রণজিৎকুমার সেন: "লালন ফকির: দ্বিশতবার্ষিকী সমীক্ষণ"। 'মাসিক বাঙলাদেশ': মাঘ ১৩৮১।
৬৮. আবুল আহসান চৌধুরী: "লালনজীবনীর উপাদান: 'হিতকরী' পত্রিকা"।' লোকসাহিত্য পত্রিকা': জানুয়ারী ১৯৭৫।
৬৯. খোন্দকার রিয়াজুল হক: "মরমী কবি লালন শাহ"। 'দৈনিক সংবাদ': ১ কার্তিক ১৩৮২।
৭০. আবুল আহসান চৌধুরী: "প্রসঙ্গ লালন শাহ"। 'সাপ্তাহিক পূর্বাণী': ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৮২।
৭১. অন্নদাশঙ্কর রায়: "বাংলার বাউল লালন শাহ ফকির"। পাক্ষিক 'ধনধান্যে': ১ অক্টোবর ১৯৭৫।
৭২. তুষার চট্টোপাধ্যায়: "লালন ফকিরের প্রতিকৃতি"। 'আনন্দবাজার পত্রিকা': ৯ শ্রাবণ ১৩৮৩।
৭৩. চিত্তরঞ্জন দেব: "রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ: লালন ফকিরের গান"। 'পরিচয়': চৈত্র ১৩৬৪।
৭৪. আশরাফ সিদ্দিকী: "লালনগীতিতে শব্দ-মটিফিম"। 'দৈনিক সংবাদ': ১৮ ও ২৫ পৌষ ১৩৮৩।
৭৫. কালিকিংকর মণ্টু: "লালন শাহ দেখতে কেমন ছিলেন"। 'দৈনিক সংবাদ': ১১চৈত্র ১৩৮৩।
৭৬. সনৎকুমার মিত্র: "রবীন্দ্রনাথ ও লালন ফকির"। 'দৈনিক সত্যযুগ': ২৫ বৈশাখ ১৩৮৪।
৭৭. এস. এম. লুৎফর রহমান: "লালন-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য"। 'দৈনিক সংবাদ': ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪।

৭৮. আবুল আহসান চৌধুরী: "লালন-গবেষণার উপাদান"। 'দৈনিক সংবাদ': ২ পৌষ ১৩৮৪।
৭৯. রুকসানা আহমেদ: "বাউলসাহিত্যে লালন শাহ"। 'দৈনিক আজাদ': ৪ পৌষ ১৩৮৪।
৮০. সনৎকুমার মিত্র: "বাউল কবি লালন: বয়স-বিতর্ক"। 'ভাবনা-চিন্তা': শারদীয়া ১৯৭৭।
৮১. সনৎকুমার মিত্র: "রবীন্দ্রনাথ-শিলাইদহ ও লালন ফকির"। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি': বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৪।
৮২. মুন্সী আবদুল মান্নান: "লোকসাহিত্য ও লালন-গীতির দর্শন"। 'লালন পরিষদ পত্রিকা': শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৫।
৮৩. বেগম জাহান আরা: "লালন-গীতির দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা"।'লালন পরিষদ পত্রিকা': শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৫।
৮৪. ম. মনির-উজ-জামান: "লালন ফকির প্রসঙ্গে আরো কিছু বক্তব্য"। 'দৈনিক বার্তা': ২৭ শ্রাবণ ১৩৮৫।
৮৫. এ.এইচ, এম ইমামউদ্দীন: "সত্যি কি লালন উচুঁদরের সুফিসাধক ছিলেন?"। 'সাপ্তাহিক ইস্পাত' (কুষ্টিয়া): ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৮৫।
৮৬. আবুল আহসান চৌধুরী: "আরশীনগরের পড়শী"। 'সচিত্র সন্ধানী': সাহিত্য সংখ্যা, ৫ ফাল্গুন ১৩৮৫।
৮৭. আবু জাফর: "লালনগানে তর্কবিতর্ক"। 'সাপ্তাহিক পূর্বাণী': ১২, ১৯, ২৬বৈশাখ, ২, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬।
৮৮. আনোয়ারুল করীম: "বাংলার সঙ্গীত ও লালন শাহ"। 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা': মাঘ-চৈত্র ১৩৮৬।
৮৯. রাহুল পিটার দাস: "লালন ফকিরের জন্ম কোন সম্প্রদায়ে"। 'সাহিত্য পত্রিকা': শীত ১৩৮৮।
৯০. রণজিৎকুমার সেন: "লালন ফকিরের গান ও রবীন্দ্রনাথ"। 'মাসিক সংহতি': আশ্বিন ১৩৮৮।
৯১. রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী: "রবীন্দ্রনাথের লালন-চর্চা"। 'সচিত্র সন্ধানী': ২০ আশ্বিন ১৩৮৯।
৯২. আবুল আহসান চৌধুরী: "দুই বাউল: রবীন্দ্রনাথ ও লালন শাহ"। 'কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ বার্ষিকী': ১৯৮৩-৮৪।

৯৩. সনৎকুমার মিত্র : "লালনের খাতা"। 'দৈনিক বসুমতী': শারদীয়া ১৩৯১।

৯৪. Sunil Kumar Banerjee : "Laalon : A Great Saint Poet and Composer". 'Lalan' (Calcutta, Quarterly) : 1 January 1987.

৯৫. R. M. Sarkar : "Lalon's Philosophy Centering round Caste". 'Lalon' (Calcutta, Quarterly) : 1 June 1987.

৯৬. আবুল আহসান চৌধুরী : "লালনচর্চার প্রথম নিদর্শন"। 'দৈনিক সংবাদ' : ২ চৈত্র ১৩৯৫।

৯৭. ম.আ. সোবহান : "নারীভজনকারী বাউল লালন শাহ"। 'সাপ্তাহিক ইস্পাত' (কুষ্টিয়া) : অগ্রহায়ণ ১৩৯৬ / ১৬ নভেম্বর ১৯৮৯।

লালন-সম্পর্কিত গ্রন্থ

১. বসন্তকুমার পাল	'মহাত্মা লালন ফকির'। বঙ্গীয় পুরাণ পরিষৎ, শান্তিপুর-নদীয়া, ১৩৬২।
২. ক্ষিতিমোহন সেন	'বাংলার বাউল'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৪।
৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	'বাংলার বাউল ও বাউলগান'। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, দীপান্বিতা ১৩৬৪। দ্বি-সঃ কলিকাতা, নববর্ষ ১৩৭৮।
৪. আহমদ হোসাইন	'বাউল-তত্ত্ব'। কুষ্টিয়া, ১৯৬১।
৫. ইন্দিরা দেবী	'বাংলার সাধক বাউল'। কলিকাতা, ১৯৬২।
৬. আনোয়ারুল করিম	'বাউল কবি লালন শাহ'। কুষ্টিয়া মে, ১৯৬৩। দ্বি-স : কুষ্টিয়া, জুলাই ১৯৬৬।
৭. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	'বাংলার বাউল : কাব্য ও দর্শন'। কলিকাতা ১৯৬৪।
৯. মুহম্মদ আবু তালিব	'লালন শাহ ও লালনগীতিকা'। ১ম খণ্ড। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৬৮ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫)।

১০. মুহম্মদ আবু তালিব — 'লালন শাহ ও লালনগীতিকা'। ২য় খণ্ড। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৬৮ (শ্রাবণ ১৩৭৫)।

১১. মুহম্মদ আবু তালিব — 'লালন পরিচিতি'। পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮।

১২. আব ইমরান হোছাইন — 'জওয়াবে ইবলিস'। কুষ্টিয়া, ১৯৬৮।

১৩. এ.এইচ.এম. ইমামউদ্দীন — 'বাউল মতবাদ ও ইসলাম'। কুষ্টিয়া, ১৯৬৯।

১৪. খোন্দকার রিয়াজুল হক — 'লালন শাহের পুণ্যভূমি: হরিশপুর'। যশোর, ১ কার্তিক ১৩৭৯।

১৫. আহমদ শরীফ — 'বাউলতত্ত্ব'। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৭৯ (ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩')।

১৬. আবুল আহসান চৌধুরী — 'কুষ্টিয়ার বাউলসাধক'। কুষ্টিয়া, পৌষ ১৩৮০ (জানুয়ারী ১৯৭৪)।

১৭. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত — 'লালন স্মারকগ্রন্থ'। বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা, চৈত্র ১৩৮০ (মার্চ ১৯৭৪)।

১৮. সুবোধ চক্রবর্তী — 'বাঙলার বাউল লালন ফকির'। আদিত্য প্রকাশালয় কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৮৩। দ্বি-মু: কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৮৫।

১৯. খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত — 'লালন সাহিত্য ও দর্শন'। মুক্তধারা, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৭৬।

২০. তুষার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত — 'লালন স্মরণিকা'। চাকদহ কলেজ, চাকদহ-নদীয়া, ১৯৭৬।

২১. আনোয়ারুল করীম — 'ফকির লালন শাহ'। লালন একাডেমী, কুষ্টিয়া, ফাল্গুন ১৩৮২ (মার্চ ১৯৭৬)।

২২. অন্নদাশঙ্কর রায়। — 'লালন ও তাঁর গান'। শৈব্যা পুস্তকালয়, কলিকাতা, বুদ্ধপূর্ণিমা ১৩৮৫। দ্বি-মু: কলিকাতা, ফেব্রুয়ারী ১৩৮৭।

২৩. ম. মনিরউজ্জামান — 'লালনজীবনী ও সমস্যা'। কুষ্টিয়া, অক্টোবর ১৯৭৮ (কার্তিক ১৩৮৫)।

২৪. সনৎ কুমার মিত্র — 'লালন ফকির : কবি ও কাব্য'। সাহিত্য প্রকাশ, কলিকাতা, ঝুলনযাত্রা ১৩৮৬।
২৫. Anwarul Karim — 'The Bauls of Bangladesh'. Lalon Academy, Kushtia, 1 January 1980.
২৬. মুহম্মদ আবদুল হাই — 'লালন শাহ ফকির'। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, মে ১৯৮০ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ / রজব ১৪০০)।
২৭. এস.এম.লুৎফর রহমান — 'লালন শাহ—জীবন ও গান'। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৩ (কার্তিক ১৩৯০)।
২৮. আনোয়ারুল করীম — 'লালনের গান'। লালন একাডেমী, কুষ্টিয়া, ১৯৮৪।
২৯. শান্তিনয় ঘোষাল — 'লালন ফকির'। কলিকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৯১ (৮মে ১৯৮৪)।
দ্বি-প্র: ২৫বৈশাখ ১৩৯৬ (৮মে ১৯৮৯)।
৩০. এস. এম. লুৎফর রহমান — 'লালন-জিজ্ঞাসা'। ঢাকা সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ (আশ্বিন ১৩৯১)।
৩১. তৃপ্তি ব্রহ্ম — 'লালন পরিক্রমা'। ১ম খণ্ড। ফার্মা কে. এল.এম. প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, শিবচতুর্দশী ১৩৯৩।
৩২. Pranab Bandyopadhyay — 'Bauls of Bengal'. Firma KLM Pvt. Ltd., Calcutta, 1989.
৩৩. June Mcdaniel — 'The Madness of the Saints'. Chicago 1989.
৩৪. নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত — 'বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়'। লেখকের 'কান্তকবি রজনীকান্ত' (কলিকাতা, ১৩২৮) গ্রন্থে বিজ্ঞাপিত।
৩৫. সুলতানা আফরোজ — 'জাতিভেদ প্রথা ও বাংলাদেশের বাউল-সমাজ'। ফোকলোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, কুষ্টিয়া, ১৯৮৮ (১৩৯৫)।

লালনগীতির সংকলন-গ্রন্থ

১. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন	'হারামণি' ১ম খণ্ড। কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৩৭।
২. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন	'হারামণি'। ২য় খণ্ড। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪২।
৩. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন	'হারামণি'। ৩য় খণ্ড। ঢাকা, ১৯৪৮।
৪. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন	'লালন ফকিরের গান'। প্রাচ্যবাণী মন্দির, কলিকাতা, ১৯৫০।
৫. খোন্দকার রফিউদ্দিন	'ভাব-সঙ্গীত'। যশোর, ১৯৫৫। দ্বি-স: হরিশপুর-যশোর, ১৩৭৪ (১৯৬৬)।
৬. মতিলাল দাশ ও পীযূষ-কান্তি মহাপাত্র	'লালন-গীতিকা'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৮।
৭. মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন	'হারামণি'। ৫ম খণ্ড। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বৈশাখ ১৩৬৮।
৮. মুহম্মদ কামালউদ্দীন	'লালনগীতিকা'। ১ম খণ্ড। হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৬২।
	'লালনগীতিকা' ২য় খণ্ড। ঐ, জানুয়ারী ১৯৬৩।
৯. আনোয়ারুল করীম	'লালনগীতি'। কুষ্টিয়া ১৯৬৬।
১০. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন	'হারামণি'। ৬ষ্ঠ খণ্ড। হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা, আষাঢ় ১৩৭৪।
১১. মোঃ রফিকুল ইসলাম	'লালন শাহের পল্লীগীতি'। ১ম খণ্ড। ঢাকা, মার্চ ১৯৬৮।
১২. হামিদুল ইসলাম	'বাংলার প্রিয় লালন-গীতি'। তৃ-প্র: ঢাকা, বৈশাখ ১৩৯২ (এপ্রিল ১৯৮৫)।
১৩. এস.এম. লুৎফর রহমান	'লালন-গীতি চয়ন'। ১ম খণ্ড। ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৫ (অগ্রহায়ণ ১৩৯২)।
১৪. ম. মনিরউজ্জামান	'লালন ফকীরের গান'। ১ম খণ্ড। কুষ্টিয়া, চৈত্র ১৩৯৩ (মার্চ ১৯৮৭)।

১৫. এম. মাসুদ পারভেজ — 'আমার প্রিয় লালনগীতি'। দ্বি-প্র : নরসিংদী, ৭ জুলাই ১৯৮৮।

১৬. খোন্দকার রিয়াজুল হক — 'লালন সংগীত চয়ন'। হরিণাকুণ্ডু-ঝিনাইদহ, ২০ জুন ১৯৮৯ (৫ আষাঢ় ১৩৯৬)।

১৭. সখিনা ছাত্তার — 'সবার প্রিয় লালনগীতি'। ঢাকা, প্রকাশকালের উল্লেখ নেই।

১৮. মোঃ নুরুজ আলী (সবুজ) — 'জনপ্রিয় লালনগীতির আসর'। নূ-স : তারিখবিহীন।

লালনগীতির ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থ

১. Abu Rushd (অনূদিত) — 'Songs of Lalon Shah'. Bengali Academy, Dacca, April 1964.

২. Muhammad Mansour-uddin (অনূদিত) — 'Folksongs of Lalon Shah'. Dacca, (?).

৩. M. Mizanur Rahman (অনূদিত) — 'Myriad Miracle—Lalon's Song'. Dhaka, January 1987.

৪. Brother James — 'Songs of Lalon'. Dhaka, 1987.

লালনগীতির স্বরলিপি-গ্রন্থ

১. কাজী নাসির — 'লালন সংগীত স্বরলিপি'। ফোকমিউজিক কাউন্সিল, ঢাকা, ১৯৮১।

২. সুধীন দাশ — 'লালন সংগীত স্বরলিপি'। ১ম খণ্ড। লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ, ঢাকা, ১৭ চৈত্র ১৩৯২ (৩১ মার্চ ১৯৮৬)।

লালন-সম্পর্কিত বিবিধ পুস্তিকা

১. — 'Lalon Shah : Folk Poet of East Pakistan'. Published by Information Deptt. On behalf of the B. N. R., Dacca, 1963 (?).

২. মকছেদ আলী শাহ ও গোলাম ইয়াছিন শাহ সম্পাদিত — 'সেদিনের এই দিনে' ('And this day')। কুষ্টিয়া, ১৯ মার্চ ১৯৮১ (৫চৈত্র ১৩৮৭)।

লালনজীবনী-ভিত্তিক উপন্যাস

১. রণজিৎকুমার সেন — 'বাউলরাজা'। মোহন লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১০ শ্রাবণ ১৩৭৩।

২. পরেশ ভট্টাচার্য — 'বাউলরাজার প্রেম'। নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ২৩ জানুয়ারী ১৯৮৬।

লালনজীবনী-ভিত্তিক নাটক

১. আসকার ইবনে শাইখ — 'লালন ফকীর'। সাতরং প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৯।

২. মন্মথ রায় — 'লালন ফকির'। "সংহতি": কলিকাতা, শারদীয়া ১৩৭৮ (৩৮ বর্ষ ৬ সংখ্যা)। 'লালন ফকির'। "মন্মথ রায় নাট্যগ্রন্থাবলী" (২য় খণ্ড)। মনমথন প্রকাশন, কলিকাতা, জগদ্ধাত্রী পূজা ১৩৮৯ (২৫ নভেম্বর ১৯৮২)। 'লালনামৃত'। কলিকাতা, (?)।

৩. দেবেন্দ্রনাথ নাথ — 'সাঁই সিরাজ বা লালন ফকির'। ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৭৯।

৪. কল্যাণ মিত্র — 'লালন ফকির'। মুক্তধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭। দ্বি-স: ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩।

৫. রণজিৎকুমার সেন — 'বাউলরাজা। "চিত্রিতা": কলিকাতা, শারদীয়া (?)।

লালন-বিষয়ক ছোটগল্প

১. সুনির্মল বসু — 'লালন ফকিরের ভিটে'। "লালন ফকিরের ভিটে"। কলিকাতা, ১৯৩৬।

২. শওকত ওসমান — 'দুই মুসাফির'। "প্রস্তর ফলক"। এ.বি. পাবলিকেশনস্, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৬৪)।

লালন-সম্পর্কিত কবিতা

১. বসন্তকুমার পাল — [লালন ফকির]। রচনাকালঃ চৈত্র ১৩২১। "মহাত্মা লালন ফকির"। শান্তিপুর-নদীয়া, ১৩৬২।

২. সৈয়দউদ্দীন — [লালন] 'মাসিক সওগাত' : ১৩৩৫(?)।

৩. শামসুর রাহমান — 'লালনের গান'। "রৌদ্র করোটিতে"। ঢাকা, আষাঢ় ১৩৭০ (জুলাই ১৯৬৩)।

৪. আহমদ রফিক — 'লালনের সমাধি-তে'। "বাউল মাটিতে মন"। ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৭৭

৫. আবুল আহসান চৌধুরী — 'লালন ফকির'। "স্বদেশ আমার বাঙলা"। কবিকণ্ঠ প্রকাশনী, কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯৭১।

৬. মহাদেব সাহা — 'লালন থেকে ফিরে এসে'। "হুলিয়া": কুষ্টিয়া, জুন-জুলাই ১৯৮৪।

৭. আসাদ চৌধুরী — 'বিস্ময় নেই প্রতীক্ষায়'। "বিত্ত নাই বেসাত নাই"। মুক্তধারা, ঢাকা, অগ্রহায়ণ ১৩৮৩ (নভেম্বর ১৩৭৬)।

লালনের প্রতিকৃতি ও ভাবসাধনা-কেন্দ্রিক চিত্র

১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর — 'লালন ফকীর'। শিলাইদহ বোট: ২৩ বৈশাখ ১২৯৬ (৫ মে ১৮৮৯)।

২. নন্দলাল বসু — 'লালন'। ১৯১৬।

৩. শহিদ কবির — 'অসীমের সন্ধানে লালন'। "দৈনিক সংবাদ": ১২ মার্চ ১৯৭৮ (২৮ ফাল্গুন ১৩৮৪)।

চলচ্চিত্রে লালন শাহ

১. সৈয়দ হাসান ইমাম পরিচালিত 'লালন ফকির'। ঢাকা, ১৯৭০ (?)।
২. শক্তি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'লালন ফকির'। কলিকাতা, ১৯৭৬ (অসমাপ্ত)।

লালনগীতির গ্রামোফোন রেকর্ড

১. মকসেদ আলী সাঁই	হিজ মাস্টার্স ভয়েস। কলিকাতা, ১৯৭১। দু'টি গান।
২. মঞ্জু দাশ	হিজ মাস্টার্স ভয়েস। কলিকাতা, ১৯৭১ (?)। দু'টি গান: একটি লালনের, অপরটি গগন হরকরার।
৩. প্রহলাদ ব্রহ্মচারী ও অমর পাল	হিজমাস্টার্স ভয়েস কলম্বিয়া। কলিকাতা, ১৩৮১। দু'টি গান।
৪. পূর্ণদাস বাউল, আরতি মুখোপাধ্যায়, নির্মেলেন্দু চৌধুরী, প্রতিমা বন্দ্যো-পাধ্যায়, প্রহলাদ ব্রহ্মচারী, অরুন্ধতী হোম চৌধুরী ও সবিতাব্রত দত্ত।	'অবিস্মরণীয় লালন': লং প্লে রেকর্ড। রেকর্ড-কভারের পরিচিতি: অন্নদাশঙ্কর রায়। হিজ মাস্টার্স ভয়েজ। কলিকাতা, ১৩৮২।
৫. ফরিদা পারভীন	বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড। ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৮০। MLP-0044; 33 RPM. চারটি গান।
৬. ফরিদা পারভীন	'মনের মানুষ যেখানে'—লালনের গান: দীর্ঘ বাদন। 'শ্রোতার আসর': ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪। SL 0781-011 ;$33\frac{1}{3}$ RPM. বারোটি গান।

লালনের নামে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা

১. 'লালনের দেশ কুষ্টিয়া' (বিশেষ জেলা সংখ্যা)	'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'। ঢাকা ১৬ এপ্রিল ১৯৭৬। ৩ বৈশাখ ১৩৮৩। (আবুল আহসান চৌধুরী পরিকল্পিত)।

সামাজিক প্রতিক্রিয়া : লালন-বিরোধী আন্দোলন

সমকাল ও উত্তরকালে লালন সম্পর্কে ইতি ও নেতিবাচক দুই ধরনের সামাজিক প্রতিক্রিয়াই প্রবল হয়েছিল। যুগপৎ নন্দিত ও নিন্দিত হয়েছিলেন তিনি। লৌকিক বাংলার এই অসাধারণ মনীষী-ব্যক্তিত্ব তাঁর সমকালেই সুধীসমাজের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণে সক্ষম হন। তাঁর প্রতি ঠাকুরবাড়ীর একাধিক সদস্যের সানুরাগ কৌতূহল তাঁর পরিচয়ের ভূগোলকে আরো প্রসারিত করে। লালনের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ-অনুরাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

লালনের জীবৎকালেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সূচনা হয়। বাউল বা লালন-বিরোধী আন্দোলনের তথ্য-খতিয়ান সংগ্রহ করলে এই প্রতিক্রিয়ার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে।

জন্মলগ্ন থেকেই বাউলসম্প্রদায়কে অবজ্ঞা-নিন্দা-নিগ্রহ-বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। 'চৈতন্যচরিতামৃত' কিংবা 'রাগাত্মিকা পদে' ইঙ্গিত আছে বাউল-সম্প্রদায়ের প্রতি সেকালের মানুষের অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা কতো তীব্র ছিলো। প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রাচারী হিন্দু আর শরীয়তপন্থী মুসলমান উভয়ের নিকট থেকেই বাউল অসহিষ্ণু আচরণ আর অবিচার অর্জন করেছে। উনিশ শতকে বাউলমতবাদ যেমন উৎকর্ষের শিখর স্পর্শ করে, আবার তেমনি পাশাপাশি এর অবক্ষয়ও আরম্ভ হয় এই সময় থেকেই। ওহাবী, ফারায়জী, আহলে হাদীস প্রভৃতি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ফলে এঁদের প্রতি অত্যাচার-নিগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাউলসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অনেকাংশে বিপন্ন হয়ে পড়ে। হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮০—১৮৪৯), তীতুমীর (১৭৮২—১৮৩১), কারামত আলী জৌনপুরী (১৮০০—১৮৭৩) দুদু মিয়া (১৮১৯—১৮৬২), মুন্সী মেহেরুল্লাহ (১৮৬১—১৯০৭), সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী (১৮৬৭—১৯২৩) প্রমুখ ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকের উদ্যোগ, প্রচেষ্টায় বাউলমতের প্রভাব-প্রসার খর্ব-ক্ষুণ্ণ হয়। অনেকক্ষেত্রেই বাউলদের প্রতি আলেমসমাজের একটি বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাবের প্রকাশ

লক্ষ্য করা যায়। বাউল বা নাড়ার ফকির সম্পর্কে মুন্সী মেহেরুল্লাহর ধারণা ছিলো, "বানাইল পশু তারা বহুতর নরে" ('মেহেরুল ইসলাম')। এই সংস্কার-আন্দোলনের প্রভাবে মীর মশাররফ হোসেনও বাউলদের সম্পর্কে অক্লেশে বলেছেন, "এরা আসল সয়তান, কাফের, বেঈমান/তা কি তোমরা জাননা"। ('সঙ্গীত লহরী')। কবি জোনাব আলি প্রচণ্ড আক্রোশে সরাসরি বলেছেন, "লাঠি মার মাথে দাগাবাজ ফকিরের"। এ-ছাড়া বাউল-ফকিরদের বিরুদ্ধে রচিত হয়েছে নানা বই, প্রদত্ত হয়েছে নানা বিধান আর ফতোয়া।[১৫৩]

প্রচলিত শাস্ত্রধর্মের বিরোধী ও মানবমিলনের প্রয়াসী লালনের জীবৎ-কালেই লালন-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত। তাঁর মতবাদ ও সাধনা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শাস্ত্রবাদী ধর্মগুরু ও রক্ষণশীল সমাজপতিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে:—বারংবার তিনি হয়েছেন লাঞ্ছিত-অপমানিত-সমালোচিত। কিন্তু লালন ধীর, স্থির, লক্ষ্যগামী। কোনো অন্তরায়, প্রতিবন্ধকতাই তাঁকে নিরুৎসাহিত বা নিরুদ্ধ করতে পারেনি। সব বিরোধিতাকে তুচ্ছ করে তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছেন সত্যাভিমুখে—পরম প্রত্যাশিত মনের মানুষকে পাওয়ার আশায়। লালন গূঢ়-গুহ্য দেহবাদী সাধনার তত্ত্বজ্ঞ সাধক। তাই এইসব দুঃখ-আঘাত-বেদনার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তাঁর গানে প্রতিফলিত হয়নি।

কাঙাল হরিনাথের সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় (ভাদ্র ১ম সপ্তাহ ১২৭৯/আগস্ট ১৮৭২) 'জাতি' শীর্ষক আলোচনায় লালন ফকির সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আলোকপাত করা হয়। হিন্দুসম্প্রদায়ের 'জাতি'-বিপন্নতার জন্য লালন ও তাঁর সম্প্রদায়কে এখানে দায়ী করা হয়েছে। লালন জাতি-ভেদহীন হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনায় যে অভিনব প্রেক্ষাপট রচনা করেছিলেন হিন্দু সমাজনেতারা তা অনুমোদন করেনি। 'গ্রামবার্ত্তা'র নিবন্ধ-কার মন্তব্য করেছেন:

> ...এদিকে ব্রাহ্মধর্ম জাতির পশ্চাতে খোঁচা মারিতেছে, ওদিকে গৌরবাদিরা তাহাকে আঘাত করিতেছে, আবার সে দিকে লালন সম্প্রদায়িরা, ইহার পরেও স্বেচ্ছাচারের তাড়না আছে। এখন জাতি তিষ্টিতে না পারিয়া, বাঘিনীর ন্যায় পলায়ন করিবার পথ দেখিতেছে।

১৯০০ সালে প্রকাশিত মৌলভী আবদুল ওয়ালীর 'On Curious Tenets and Practices of a certain Faqirs in Bengal' প্রবন্ধে লালন সম্পর্কে

সামান্য ইঙ্গিত ও মন্তব্য আছে। এই প্রবন্ধের একস্থানে মুসলমান বাউল-ফকিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

The so-called Musalman Faqirs speaking to another Musalman try their best to argue against Islam, and to mtsinterpret or misquote passages in support of their doctrines.[১৩৪]

বাউল-ফকিদের সম্পর্কে তৎকালে এই ছিলো প্রায়-সর্বজনীন ধারণা। বলাবাহুল্য বাউলশ্রেষ্ঠ লালনও এই ধারণার আওতামুক্ত ছিলেন না।

মুন্সী এমদাদ আলী (১৮৮১—১৯৪১) প্রণীত 'রদ্দে নাড়া' (অপ্রকাশিত: ২৪ আষাঢ় ১৩২৪) পুঁথিতে বাউল বা 'নাড়ার ফকির'দের বিশদ পরিচয় দিয়ে তাদের তীব্র নিন্দা-সমালোচনা করা হয়েছে। লেখক প্রসঙ্গক্রমে পুঁথির ভূমিকায় লালন শাহের নামোল্লেখ করে বলেছেন:

নাড়া ইত্যাদী ইত্যাদী ইহাদিগের মধ্যে আমাদের দেষে এই নাড়ার হট্টগোলই বেশী। আমাদের দেষে প্রধানত দুই শ্রেণীর নাড়া দেখিতে পাওয়া জায়। এক শ্রেণীর নেতা জেলা নদীয়া মহকুমা কুষ্টিয়ার অধিন ছেওড়ীয়ানিবাসী লালন সা তাহার রচিত বহুবিধ গান লোকমুখে প্রচলিত আছে। কিন্তু রচিত কোন পুস্তকাদী নাই।... নাড়ার ধর্ম্ম সম্বন্ধেও আমি যতদূর নিজে অবগত হইয়াছি ইনশাআল্লা পাঠক-পাঠীকাগণের নিকট উপস্থিত করিব বাসনা করিয়াছি। ইহার দ্বারা মছলেম সমাজে কোন উপকার হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।[১৩৫]

লেখক এরপর বাউল বা 'নাড়াধর্ম' সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন:

নাড়া যে কি ধর্ম্ম তাহা ব্যাক্ত করা বড়ই দুরহ। এমন অসভ্য অশ্লীল ব্যবহার জগতে কোন মনুষ্যের দ্বারা হইতে পারে এমন বিশ্বাস হয়না।[১৩৬]

রংপুর জেলার বাঙ্গালীপুর-নিবাসী মওলানা রেয়াজউদ্দীন আহমদ 'বাউলধ্বংস ফৎওয়া' অর্থাৎ 'বাউলমত ধ্বংস বা রদকারী ফৎওয়া' প্রণয়ন ও প্রচার করেন। বাং ১৩৩২ সালে এই 'ফৎওয়া'র দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাঙলার প্রসিদ্ধ ওলামা ও নেতৃবৃন্দ এই ফতোয়া সমর্থন ও অনুমোদন করেছিলেন। 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া'র ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় বাং ১৩৩৩ সালে। ২য় খণ্ডের প্রধান উল্লেখ্য বিষয় হলো লালন শাহ সম্পর্কে মন্তব্যসহ একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ। এতে লালন

সম্পর্কে মুসলিম-সমাজ ও ধর্মীয় নেতৃন্দের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। 'ফৎওয়া'র এই ২য় খণ্ডে বসন্তকুমার পালের 'ফকির লালন সাহ' ('প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৩২) প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করা হয়েছে :

লালন সাহের জীবনী...পাঠে বুঝা যায় লালন সাহার ধর্ম্মের কোনই ঠিক ছিলনা। বরঞ্চ তাহার ভাবের গান ও কবিতাবলির ভিতর দিয়া পরিস্ফুটিত হয় যে তিনি হিন্দু জাতির একজন উদাসীন ছিলেন। তিনি কেবল মোছলমানের হস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছিলেন বলিয়াই, হিন্দুসমাজ তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন। তিনি মোছলমানের অন্ন ভোজন ব্যতীত, এছলাম গ্রহণ করেন নাই, বা মোছলমান বলিয়া নিজকে স্বীকার করেন নাই বা এছলামের আকিদা, বিশ্বাস ও নামাজ, রোজা প্রভৃতির কোন চিহ্নই কিম্বা আচারব্যবহার কিছুই তাহার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল না, যদ্দারা তাহাকে মোছলমান বলা যাইতে পারে, তিনি এছলামের হোলিয়া অনুসারে মোছলমানের দরবেশ ফকির হওয়া দূরে থাক একজন মোছলমান বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারন না, তিনি যত বড়ই মুনি-ঋষি, উদাসীন হউন না কেন, মোছলমানের তিনি কেহই নহেন। কেহ মোছলমানের অন্ন খাইয়াই মোছলমান হইতে পারেন না। কারণ অনেক অমোছলমানই মোছলমানের পাকে ভোজন করিয়া থাকে। যাহার মধ্যে এছলামের রীতি-নীতি ও কার্য্যকলাপগুলি শরীয়তের কাটায় মিলিবে না, তিনি মুনি ঋষি, দরবেশ ফকির যে কোন নামেই পরিচিত হউন না কেন, মোছলমান তাহাকে কোনই শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত করিয়া লইতে পারেনা। অতএব লালন সাহার মধ্যে শরীয়তের চিহ্ন না থাকায় তিনি মোছলমান সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। সুতরাং বাউল বা ন্যাড়ার ফকিরগণ যে লালন সাহাকে মোছলমানের সেরা পীর, দরবেশ বলিয়া তাহার পদ অনুসরণ-করতঃ মোছলমানের দরবেশ ফকিরের দাবী করিয়া দুনিয়াটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে, ইহা তাহাদের সর্ব্বৈ পথভ্রষ্টের পরিচয় মাত্র।

লালন সাহার পরিচয় ত ইহাই দাঁড়াইল কিন্তু বাউল, ন্যাড়ার ফকিরগণ লালন সার সম্বন্ধে কোনই পরিচয় না জানিয়া হুজুগে মাতিয়া হিন্দু বৈষ্ণবগণের দেখাদেখি লালন সার পদে গা ঢালিয়া দিয়া

মোছলমান সমাজের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছে ইহা অতিশয় পরিতাপের বিষয়। তাহাদের ধাঁধা এখন ঘুচিবে কি?[১৫৭]

বঙ্গদেশের মুসলমানসমাজের একজন প্রধান মুখপাত্র ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮---১৯৬৮)। বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি ও ধর্ম-বিষয়ে আকরম খাঁর মতামত ছিলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাউল-ফকিরদের সম্পর্কে তিনিও প্রতিকূল মত পোষণ করতেন। বাউল-মতের প্রসার মুসলিমসমাজের চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ বলে মনে করতেন। এ-সম্পর্কে তিনি তাঁর 'মোছলেমবঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন :

> তৃতীয় যুগ তথা পতন যুগের শেষ দশকগুলির সমাপ্তির দিকে উপরে বর্ণিত (পৃঃ ১১১—১৭) কলুষিত পরিবেশের প্রভাবে বাংলার মুসলিম-সমাজ নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার এক অতি শোচনীয় স্তরে নামিয়া যায়। এই অধঃপতনের নজীর হিসাবে আমরা এখানে (পৃঃ ১১৭-২০) মুসলমান মারফতী ফকির বা নেড়ার অর্থাৎ মরমী-বাদী ভিক্ষুকদের কয়েকটি মত-বিশ্বাস ও সাধন-পদ্ধতির উল্লেখ করিতেছি। এই সমস্ত ফকিরের দল বিভিন্ন সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল—যাহা আউল, বাউল, কর্তাভজা ও সহজিয়া ইত্যাদি হিন্দু বৈষ্ণব অথবা চৈতন্য সম্প্রদায়ের মুছলিম সংস্করণ ব্যতীত কিছু ছিলনা।[১৫৮]

'সামাজিক জীবনের মারাত্মক ব্যাধি' (২০শ অধ্যায়) প্রসঙ্গে আকরম খাঁ "মোছলেমসমাজ যে কিরূপ সম্বিতহারা ও কর্তব্য-বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিল" তা যথাযথভাবে আলোচনা করে, অতঃপর "সম্পূর্ণ বিষয়টি স্পষ্ট করার মানসে" লালন শাহের ৬টি ও পাগলা কানাইয়ের ১টি গান সম্পূর্ণ বা আংশিক উদ্ধৃত করে এঁদের ইসলামধর্ম ও ঐতিহ্যবিরোধী মনোভাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বাঙলার ধর্মনিষ্ঠ শিক্ষিত মুসলমান লালন শাহকে কখনোই সুনজের দেখেননি। মওলানা আকরম খাঁর উপরিউক্ত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত সেই মনোভাবেরই পরিচায়ক।

মওলানা আবু ইমরান হোছাইন প্রণীত 'জওয়াবে ইবলিস' (১৯৬৮) পুস্তিকায় শরীয়তের কষ্টিপাথরে বাউল-সম্প্রদায়ের চিন্তাদর্শন ও লালনের গানের আলোচনা করা হয়েছে। 'বাউলগণের স্বরূপ' প্রসঙ্গে আলোচনা

করতে গিয়ে লেখক বলেছেন যে বাউলরা কোথাও কোথাও 'মারেফতি আবার কোথাও 'মুতখেকো ফকির' নামে পরিচিত। এই পুস্তিকায় 'ইসলাম সম্পর্কে লালনের হটোক্তি' অধ্যায়ে লালনের 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'-র একটি বিশেষ স্তবকের অর্থ-ব্যাখ্যা সম্পর্কে লেখক বলেছেন :

> তথাকথিত মারফতির কাণ্ডারী লালন শাহ গানের মাধ্যমে ত্বকচ্ছেদ লইয়া 'জাতিবিচার' কবিতায় ইসলামের ত্রুটির দিকে ইঙ্গিত করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে তাহার সীমাহীন মূর্খতাই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র।......
>
> আল্লার কালাম কিম্বা রাছুলের হাদীছে একথা বলা হইলে মুসলমানদের তরফ হইতে কিছু বলার ছিল না। কোরান-হাদীছের কোথাও এরূপ উদ্ভট উক্তি করা হয় নাই। অথচ সেই শাশ্বত ইসলামের উপরে কামড় দিতে গিয়া লালন শাহ স্বীয় বিষদন্তই ভগ্ন করিয়াছেন মাত্র।[১০৯]

মোঃ আবু তাহের বর্দ্ধমানী তাঁর 'সাধু সাবধান' (রমজান ১৪00 হিজরী) পুস্তিকায় বাউলসম্প্রদায় ও লালন ফকিরের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি লালনকে "ইসলামবিরোধী, শরিয়তবিরোধী, বেশারাহ, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ফকির" বলে অভিহিত করে মন্তব্য করেছেন :

> লালন আল্লাহকে ও আল্লার সৃষ্ট মানুষকে একাকার করে দিয়েছে। লালনের গানে আছে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ ; লালনের গানে আছে নর-নারীর অবাধ মিলনের প্রেরণা, লালনের গানে আছে গুপ্ত যৌন প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার গভীর উৎসাহ ; লালনের গানে আছে নাপাক দ্রব্য ভক্ষণ করার প্রেরণা ; লালনের গানে আছে তৌহিদ-বিরোধী কালাম। লালনের গানে আছে শরীয়তবিরোধী কথা। লালন আজ নাই, কিন্তু লালনের হাজার হাজার রূহানী সন্তান বিরাজ করছে। তার ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণার জালে ফেলে হাজার হাজার মানুষকে সে বিভ্রান্ত করে গেছে।[১৬০]

ম. আ. সোবহান তাঁর 'বাউল একটি ফেতনা' নামক রচনায় লালনকে 'বাউলদের নবপয়গম্বর' বলে ব্যঙ্গ করেছেন।[১৬১] অন্যত্র তিনি লালনকে 'নারীভজনকারী' বলে নিন্দা করে বলেছেন, "নারীভজন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল লালন শাহের একমাত্র সাধ্যসাধনা।"[১৬২]

লালনের সমকালে যেমন তাঁর দেহত্যাগের পরও তেমনি তাঁর অনুসারীদের উপর কম অত্যাচার হয়নি। কুষ্টিয়া অঞ্চলেই এ-ধরনের ঘটনা বেশী ঘটেছে। এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কুষ্টিয়ার বানিয়াপাড়ানিবাসী মওলানা আফছারউদ্দীন আহমেদের (১৮৮৭-১৯৫৯) আন্দোলনের কথা। ইনি ছিলেন বিভাগপূর্বকালের মন্ত্রী শামসুদ্দীন আহমেদের (১৮৮৯—১৯৬৯) মধ্যাগ্রজ। বাং ১৩৫৩ সালে আফছারউদ্দীন দোলপূর্ণিমার বার্ষিক উৎসবে ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় আগত অনেক বাউলের ঝুঁটি ও বাবরি কেটে দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে লালন-প্রশিষ্য ছেঁউড়িয়ার ইসমাইল শাহ ফকির প্রাণভয়ে দীর্ঘকাল গৃহছাড়া হয়েছিলেন। আফছারউদ্দীনের জীবদ্দশায় লালনের আখড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সাড়ম্বরে বাউল-ফকিরদের কোনো অনুষ্ঠান হতে পারেনি।

এরপর কুষ্টিয়ার মওলানা মেছবাহুর রহমানের (১৯০৭—১৯৮৭) নেতৃত্বে এ-বিষয়ে বিশেষ তৎপরতা পরিচালিত হয়। তিনি লালনপন্থীদের বিরুদ্ধে বাহাসে অংশগ্রহণ ও প্রচারপত্র বিলি করেন। বিশেষ করে ষাটের দশকের সূচনায় লালন স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সময় ইনি এর তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা করেন। এর কয়েক বছর পর ১৯৬৫ সালে তৎকালীন জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে যখন লালনের নামানুসারে কুষ্টিয়া জেলার নতুন নামকরণের প্রস্তাব হয় তখন এই প্রচেষ্টার প্রতিবাদে মেছবাহুর রহমান একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। কুষ্টিয়ার পাক প্রেস থেকে মুদ্রিত প্রচারপত্রটির প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :

> শোনা যাচ্ছে কুষ্টিয়া জেলার নাম পরিবর্তন করে 'লালনশাহী' এবং কুষ্টিয়া শহরের নাম পরিবর্তন করে 'লালননগর' করার ষড়যন্ত্রে কেউ কেউ মেতে উঠেছেন এবং তা জেলা কাউন্সিলের সভায় পাশ করানোর চেষ্টা করছেন।
>
> সকলেই জানে লালন একজন বেদ্বীন, বেশরা, জাত-ধর্ম্মহীন নাড়ার ফকির যাদেরকে কুষ্টিয়াবাসী ঘৃণাই করে থাকে। লালনের ধর্ম্মমতের 'চারিচন্দ্রভেদ', 'ষড়চক্র', 'মূলাধারচক্র', 'দ্বীদলপদ্ম', 'সহস্রদলপদ্ম', 'অধর মানুষ', 'সহজ মানুষ', 'ত্রিবেণী', 'আল', 'বিন্দু', 'সাধনসঙ্গিনী', 'প্রেমভাজা', প্রভৃতি কাম আরাধনার ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দসমূহের তাৎপর্য কি তা জানলে বা তার অবতারবাদের সংবাদ জানলে যে কোন

রুচিসম্পন্ন মানুষ লালন এবং তাঁর অনুসারীদের নাম মুখে আনতেও ঘৃণা বোধ করবে।

কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে সত্য জানবার কোন প্রকার চেষ্টা না করে কিছু সংখ্যক ক্ষমতাবান জ্ঞানপাপী একটা নূতন কিছু করে হঠাৎ যশস্বী হওয়ার চেষ্টায় মেতে উঠেছেন। তারা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে জনমতের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করে জনসাধারণের অর্থের শ্রাদ্ধ করে গঞ্জিকাসেবনের আখড়া এবং কবরপূজার কেন্দ্র উদ্বোধন করুন, তাতে আমরা তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করলেও, বাধা দিতে না পারায় আপাতঃ নীরবতা অবলম্বন করে থাকতে পারি, কিন্তু তাদের অপচেষ্টা যদি জনসাধারণকেও মানাতে বাধ্য করার ষড়যন্ত্র করে থাকেন, তবে তাদের স্মরণ রাখতে অনুরোধ করছি হিসাবে তাদের মারাত্মক ভুল হয়ে যাচ্ছে। কুষ্টিয়ার জনসাধারণ এই হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছে।[১৬৩]

ধর্মবেত্তাদের পাশাপাশি কিছু শিক্ষিত সুধীজনের নিকটে লালনের ধর্ম ও সাধনাই শুধু নিন্দিত হয়নি, তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভাও অস্বীকৃত হয়েছে। ত্রিপুরা জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে শিক্ষাবিদ ডক্টর মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন মন্তব্য করেন যে, লালনসহ অন্যান্য লোককবি যে-সব গান রচনা করে গেছেন "তাহাতে যথেষ্ট রসবোধের পরিচয় নাই" এবং "এগুলি গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট বলিয়া ভদ্রসমাজে স্থান করিয়া লইতে পারে নাই।"[১৬৪]

কোনো কোনো লেখক আবার বাউলগানকে পাকিস্তানের আদর্শবিরোধী বলেও মনে করেছেন। ইবনে তালিব ওবায়দুল্লাহ তাঁর 'বাউলের ইতিকথা' প্রবন্ধে মূলত লালনের গানকে অবলম্বন করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।[১৬৫]

বাউলদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন সম্পর্কে মুক্তমন বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের নামে তাঁরা বাউলদের উপর অত্যাচার-নিগ্রহকে সমর্থন করেননি। এঁদের মধ্যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা কাজী আবদুল ওদুদ(১৮৯৪-১৯৭০), ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাউল-নির্যাতন প্রসঙ্গে আবদুল ওদুদ বলেছেন :

> এই মারফত-পন্থীর বিরুদ্ধে আমাদের আলেম-সম্প্রদায় তাঁদের শক্তি প্রয়োগ করেছেন, আপনারা জানেন। এই শক্তি প্রয়োগ দূষনীয় নয় —সংঘর্ষ চিরদিনই জগতে আছে এবং চিরদিনই জগতে থাকবে। তা ছাড়া এক যুগ যে সাধনাকে মূর্ত করে তুলল, অন্য যুগের ক্ষুধা তাতে নাও মিটতে পারে। কিন্তু আলেমদের এই শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে কথা বলবার সবচাইতে বড় প্রয়োজন এইখানে যে সাধনার দ্বারা সাধনাকে জয় করবার চেষ্টা তাঁরা করেননি, তার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত দুর্বলকে লাঠির জোরে তাঁরা দাবিয়ে দিতে চেয়েছেন। এ-দেশী মারফত-পন্থীদের সাধনার পরিবর্তে যদি একটা বৃহত্তর পূর্ণতর সাধনার সঙ্গে বাংলার যোগসাধনের চেষ্টা আমাদের আলেমদের ভিতরে সত্য হতো, তাহলে তাঁদের কাছ থেকে শুধু বাউলধ্বংস আর নাসারা দলন ফতোয়াই পেতামনা।[১৬৬]

বাউল-বিরোধী আন্দোলনের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নেই ; থাকলে জানা যেতো কী অমানুষিক অত্যাচার ও নির্মম নিগ্রহ এই মরমীসাধক বাউলদের সহ্য করতে হয়েছে। একতারার বিরুদ্ধে চলেছে লাঠির সংগ্রাম। বাঙলার সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের এ এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। বাঙলার বাউলের প্রাণপুরুষ ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হওয়ার দরুণ প্রায় সব আঘাতই লালন অথবা তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের উপরে এসেছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন :

> শরীয়তবাদী মুসলমানগণ লালনকে ভালো চোখে কোনোদিনই দেখেন নাই। এ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল লালনের খ্যাতি-প্রতিপত্তির দিনেও তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছে।...এই বাউল-পন্থী নেড়ার ফকিরেরা চিরকাল... অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে।[১৬৭]

একটি গানে লালন বলেছেন :

"এ দেশেতে এই সুখ হলো আবার কোথা যাই না জানি"—এই পংক্তিটিতে তত্ত্ব ছাপিয়ে তাঁর নিপীড়িত জীবনের মর্মবাণীই যেনো ফুটে উঠেছে।

'হিতকরী' পত্রিকার লালন-সম্পর্কিত নিবন্ধ

এ-যাবত প্রাপ্ত লালন সম্পর্কে প্রকাশিত তথ্যাবলির মধ্যে পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকার উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। লালনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১৮৯০ সালের ৩১ অক্টোবর (১২৯৭ সালের ১৫ কার্তিক)-এর 'হিতকরী' পত্রিকার ১ম ভাগ ১৩শ সংখ্যার উপ-সম্পাদকীয়স্তম্ভে (পৃঃ ১০০-১০১) 'মহাত্মা লালন ফকীর' নামে এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হলেও তা তথ্যবহুল, প্রামাণিক ও সুলিখিত। 'মহাত্মা লালন ফকীর' নিবন্ধে লালন শাহের জীবনী সম্পর্কে যে তথ্য-সংকেত পাওয়া যায় তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। এই নিবন্ধ থেকে ব্যক্তি ও সাধক লালনের কিছু অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে। 'হিতকরী'র এই নিবন্ধ সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ('ভারতী': ভাদ্র ১৩০২)। পরবর্তীকালে বসন্তকুমার পাল তাঁর 'মহাত্মা লালন ফকির' গ্রন্থে এই নিবন্ধটি সম্পূর্ণ প্রকাশ করেন। চিত্রপ্রতি-লিপিসহ এটি পরে আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত 'লালন স্মারকগ্রন্থে' মুদ্রিত হয়। 'হিতকরী'তে প্রকাশিত কোনো নিবন্ধেই লেখকের নাম থাকতো না। (আমি যতগুলো সংখ্যা দেখার সুযোগ পেয়েছি অন্তত তার মধ্যে নেই)। সম্ভবত মীর মশাররফ হোসেন এবং কুষ্টিয়ার উকিল রাইচরণ দাস (যিনি একাধারে 'হিতকরী'র সহ-সম্পাদক ও এজেন্ট ছিলেন) অধিকাংশ সময় এই নিবন্ধ গুলি লিখতেন। ১ম ভাগ ১৩শ সংখ্যার 'হিতকরী'তে তিনটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যথাক্রমে: ১. 'জমিদার' ২. 'মহাত্মা লালন ফকীর', ও ৩. 'ইনকম ট্যাক্স'। 'মহাত্মা লালন ফকীর' নিবন্ধে লালন শাহের জীবন, সাধনা ও সঙ্গীত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। এটিও যে কার রচনা তার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়না। তবে যতদূর মনে হয়

এটি রাইচরণ দাসের রচনা। এই ধারণার সঙ্গত কারণও আছে। রাইরচণ দাস লালনের পরিচিত ছিলেন। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও রাইচরণ দাসের সঙ্গে লালনের যোগাযোগ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, "কুষ্টিয়ার উকিল বাবু রাইচরণ বিশ্বাস [দাস], কুমারখালীর খ্যাতনামা হরিনাথ মজুমদার ও তাঁহার ফিকিরচাঁদের দলস্থ লোকের লালনের অনেক গান ও জীবনের অনেক ঘটনা জানেন ...।" ('ভারতী' : ভাদ্র—১৩০২ ; পৃঃ ২৮১)। সাহিত্যরসিক রাইচরণ দাস কুষ্টিয়ার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। তাঁর বাড়ী ছিল কুষ্টিয়া শহরের মধ্যস্থিত আমলাপাড়ায়। এই স্থানে 'রাইচরণ ব্যারাক' এখনো তাঁর স্মৃতিচিহ্ন বহন করে আছে। তাঁরই দৌহিত্র শ্রীকুমারেশ ঘোষ বর্তমানে পশ্চিমবাঙলার একজন বিশিষ্ট কথাশিল্পী ও সাময়িকপত্রসেবী। আমলা পাড়া থেকে ছেঁউড়িয়ার দূরত্ব খুব বেশী নয়—এক-দেড় মাইল মাত্র। অতএব রাইচরণের সঙ্গে লালনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা এবং ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় তাঁর যাতায়াত খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। 'মহাত্মা লালন ফকীর' নিবন্ধ পড়ে জানা যায় লেখকের সঙ্গে লালনের ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয় ছিল। এ-বিষয়ে নিবন্ধকার বলছেন, "ইহাকে (লালন) আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি"। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র উল্লেখানুযায়ী লালনকে প্রত্যক্ষদর্শী এই বক্তা যে রাইচরণ দাস তা অনুমান করা যায়। অপরদিকে মনে হতে পারে নিবন্ধটি মীর মশাররফের রচনা কিনা। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় সেইসময়ে অর্থাৎ ১৮৯০ সালের অক্টোবর মাসে লালনের মৃত্যুর সময় মশাররফ টাঙ্গাইলে ছিলেন। তাই রচনাটি তাঁর না হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। লালনের মৃত্যুর পরপরই নিবন্ধকারের ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় উপস্থিতির ইঙ্গিত নিবন্ধের মধ্যে পাওয়া যায়। লালনের মৃত্যু হয় ১৭ই অক্টোবর। আর ঐ সংখ্যা 'হিতকরী' প্রকাশিত হয় ৩১ অক্টোবর। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে উপকরণ সংগ্রহ করে নিবন্ধ রচনার জন্য ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রয়োজন সমধিক। এই সময়ের মধ্যে মীর সাহেবের কুষ্টিয়া উপস্থিতি ও নিবন্ধ রচনা সম্ভবপর নয়। 'মহাত্মা লালন ফকীরে'র গদ্যও মীর মশাররফ হোসেনের গদ্যরচনার অনুরূপ বলে মনে হয় না।

তবে মীর মশাররফ হোসেনের সঙ্গেও লালনের পরিচয় ছিল। এই পরিচয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় সতীশচন্দ্র মজুমদারের 'কুড়নো সঙ্গীত' গ্রন্থে। কাঙাল হরিনাথের সঙ্গে লালনের পরিচয়ের সূত্র ধরেই সম্ভবত লালনের সঙ্গে মীরের আলাপ-পরিচয়। মীর বাউলগান রচনায় কাঙাল হরিনাথের দ্বারাই প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছিলেন। মীর রচিত বাউলগানে কাঙালের প্রভাবই প্রত্যক্ষ। তবে তাঁর দুয়েকটি গানে লালনের গানের প্রচ্ছন্ন প্রভাবও আবিষ্কার করা যায়। মশাররফ একাধিকবার ছেঁউড়িয়া এসেছেন। তাঁর জন্মগ্রাম লাহিনীপাড়া ছেঁউড়িয়ার যথেষ্ট নিকটবর্তী গ্রাম। এ দুটি গ্রামই কুমারখালী উপ-জেলায় অবস্থিত। মীরের 'সঙ্গীত লহরী'-র তাঁর একটি গানে লালন ফকিরের নাম পাওয়া যায়। গানটির অংশবিশেষ হলো এই ঃ

আরে ভাই না পাই দিসে, কলির শেষে,
কিসে কার মন মজেছে।
ফিকিরচাঁদে, আজবচাঁদে,
রসিকচাঁদে সব মেতেছে।
কোথা আর পাগল কানাই,
লালন গোঁসাই, সব সাঁই এতে হার মেনেছে।

পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকা বাং ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাস (১৮৯০ সালের এপ্রিল) থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন লাহিনীপাড়া নিবাসী শ্রীদেবনাথ বিশ্বাস। 'হিতকরী' রজনীকান্ত ঘোষ কর্তৃক কুমারখালী মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্র থেকে মুদ্রিত হতো। প্রতি কপি পত্রিকার মূল্য ছিল দুই পাই; ডাকমাসুলসহ বার্ষিক মূল্য ছিল দুই টাকা। 'হিতকরী'তে সম্পাদকের নাম থাকতো না। সহকারী সম্পাদক হিসাবে রাইচরণ দাসের নাম ছাপা হতো। তবে বেশ বোঝা যায় মীর মশাররফ হোসেনই এই পত্রিকার সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। 'হিতকরী'র সর্বত্রই তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নামের অন্তরালে মূলত তিনিই পত্রিকাটি পরিচালনা করতেন। কাঙাল হরি-নাথের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে 'হিতকরী' আত্মপ্রকাশ করেছিল। এবং 'হিতকরী'র নির্ভীক ও সৎ সাংবাদিকতার আদর্শও কাঙাল হরিনাথ

সম্পাদিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' থেকেই অনুসৃত হয়েছিল। 'হিতকরী'র সঙ্গে কাঙাল-পুত্র সতীশচন্দ্র মজুমদার জড়িত ছিলেন। কাঙাল-শিষ্যদের মধ্যেও কারো কারো সঙ্গে এই পত্রিকার যোগ ছিল।

লালনের মৃত্যুসংবাদ সংবলিত 'হিতকরী'র এই সংখ্যাটি বহুদিন যাবৎ ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় রক্ষিত ছিল। আখড়ার পরিচালকরা কাগজটি আগ্রহী পরিদর্শকদের দেখাতেন। লালন-শিষ্যরা 'হিতকরী'র এই বিবরণীর সত্যতা সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এ বিষয়ে বসন্তকুমার পাল লিখেছেন, "তাঁহার [লালন] শিষ্য ভোলাই সাহ ও পাঁচু সাহের নিকট শুনিলাম হিতকরী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে সাঁইজীর বিষয় যাহা লেখা হইয়াছিল উহা সর্ব্বৈব সত্য।" ('মহাত্মা লালন ফকির'; পৃ: ২)। 'হিতকরী'র এই দুষ্প্রাপ্য সংখ্যাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মরহুম অধ্যাপক আলী আহমদ সাহেবের সৌজন্যে সংগ্রহ করেছিলাম।

আবুল আহসান চৌধুরী

মহাত্মা লালন ফকীর

'হিতকরী' (পাক্ষিক): ১ম ভাগ ১৩শ সংখ্যা
১৫ কার্তিক ১২৯৭/৩১ অক্টোবর ১৮৯০

লালন ফকীরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেক দূর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকীরের শিষ্য; শুনিতে পাই ইঁহার শিষ্য দশ হাজারের উপর। ইঁহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। কুষ্টিয়ার অনতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেওরিয়া গ্রামে ইঁহার একটি সুন্দর আখড়া আছে। আখড়ায় ১৫/১৬ জনের অধিক শিষ্য নাই। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল ও ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন; অন্যান্য শিষ্যগণকে তিনি কম ভালবাসিতেন না। শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহার ভালবাসার কোন বিশেষ তারতম্য থাকা সহজে

প্রতীয়মান হইত না। আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন; সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-মতানুসারে ইঁহার কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকের স্ত্রী আছে, কিন্তু সন্তান হয় নাই। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শুধু এই মহাত্মার শিষ্যগণের মধ্যে নহে বাউল-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থানে এই ব্যাপার লক্ষিত হয়। সম্প্রতি সাধুসেবা বলিয়া এই মতের এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। সাধুসেবা হইতে লালনের শিষ্যগণের না হউক নিজের মতবিশ্বাস অনেকাংশে ভিন্ন ছিল। সাধুসেবা ও বাউলের দলে যে কলঙ্ক দেখিতে পাই, লালনের সম্প্রদায়ে সে প্রকার কিছু নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি সাধুসেবায় অনেক দুষ্ট লোক যোগ দিয়া কেবল স্ত্রীলোকদিগের সহিত কুৎসিত কার্য্যে লিপ্ত হয় এবং তাহাই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। মতে মূলে তাহার সহিত ঐক্য থাকিলেও এ সম্প্রদায়ের তাদৃশ ব্যভিচার নাই। পরদার ইঁহাদের পক্ষে মহাপাপ। তবে প্রত্যেক সৎনিয়মের ন্যায় ইহারও অপব্যবহার থাকা অসম্ভব নহে। বাউল, সাধুসেবা ও লালনের মতে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন শ্রেণীতে যে একটি গুহ্য ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে লালনের দলে তাহাই প্রচলিত থাকায় ইহাদের মধ্যে সন্তান জননের পথ এককালে রুদ্ধ। "শান্ত-রতি" শব্দের বৈষ্ণবশাস্ত্রে যে উৎকৃষ্টভাব বুঝায়, ইহারা তাহা না বুঝিয়া অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়সেবায় রত থাকে। এই জঘন্য ব্যাপারে এ দেশ ছারেখারে যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গকে বেশী কিছু জানাইতে স্পৃহা নাই।

শিষ্যদিগের ও তাহার সম্প্রদায়ের এই মত ধরিয়া লালন ফকীরের বিচার হইতে পারে না। তিনি এ সকল নীচ কার্য্য হইতে দূরে ছিলেন ও ধর্ম্ম-জীবনে বিলক্ষণ উন্নত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন ফকীর বড়ই ঘৃণা করিতেন। নিজে লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই; কিন্তু ধর্ম্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্ম্ম সাধনে তাঁহার অর্ন্তদৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্ম্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার-ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত; বৈষ্ণবধর্ম্মের মত

পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা ইঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই; ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন। অধিক কি ইঁহার শিষ্যগণ ইহার উপাসনা ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত না। সর্বদা "সাঞ্জ" এই কথা মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি নোমাজ করিতেন না। সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়? তবে জাতিভেদবিহীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে; বৈষ্ণবধর্ম্মের দিকে ইঁহার অধিক টান। শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সময় সময় যে উচ্চ-সাধনের কথা ইঁহার মুখে শুনা যাইত, তাহাতে তাঁহার মত ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত। যাহা হউক তিনি একজন পরম ধার্ম্মিক ও সাধু ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। লালন ফকীর নাম শুনিয়াই হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন ইনি বিষয়হীন ফকীর ছিলেন; সামান্য জোতজমা আছে; বাটীঘরও মন্দ নহে। জিনিষপত্রও মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থের মত। নগদ টাকা প্রায় ২ হাজার বলিয়া মরিয়া যান। ইঁহার সম্পত্তির কতক তাঁহার স্ত্রী, কতক ধর্ম্মকন্যা, কতক শীতলকে ও কতক সৎকার্য্যে প্রয়োগের জন্য ইনি একখানি ফরমমাত্র করিয়া গিয়াছেন। ইনি নিজে শেষকালে কিছু উপায় করিতে পারিতেন না। শিষ্যেরাই ইঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিত। বৎসর অন্তে শীতকালে একটি ভাণ্ডারা (মহোৎসব) দিতেন। তাহাতে সহস্রাধিক শিষ্যগণ ও সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া সংগীত ও আলোচনা হইত। তাহাতে তাঁহার ৫/৬ শত টাকা ব্যয় হইত।

ইঁহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না। শিষ্যেরা হয়ত তাঁহার নিষেধক্রমে না হয় অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না। তবে সাধারণে প্রকাশ লালন ফকীর জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইঁহার জাতি। ইঁহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থগমনকালে পথে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। মুমূর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবনলাভ করিয়া ফকীর হয়েন। ইঁহার মুখে বসন্তরোগের দাগ বিদ্যমান ছিল। ইনি ১১৬ বৎসর বয়সে গত ১৭ই

অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই বয়সেও তিনি অশ্বারোহণ করিতে দক্ষ ছিলেন এবং অশ্বারোহণেও স্থানে স্থানে যাইতেন। মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতে ইঁহার পেটের ব্যারাম হয় ও হাত পায়ের গ্রন্থি জলস্ফীত হয়। দুধ ভিন্ন পীড়িত অবস্থায় অন্য কিছু খাইতেন না। মাছ খাইতে চাহিতেন। পীড়িতকালেও পরমেশ্বরের নাম পূর্ব্ববৎ সাধন করিতেন; মধ্যে মধ্যে গানে উন্মত্ত হইতেন। ধর্ম্মের আলাপ পাইলে নববলে বলীয়ান হইয়া রোগের যাতনা ভুলিয়া যাইতেন। এই সময়ের রচিত কয়েকটি গান আমাদের নিকট আছে। অনেক সম্প্রদায়ের লোক ইঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। মরণের পূর্ব্ব রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫ টার সময় শিষ্যগণকে বলেন "আমি চলিলাম।" ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাসরোধ হয়। মৃত্যুকালে কোনো সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল হরেনাম নামও দরকার [হয়] নাই। হরিনাম কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না। বাউল সম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব হইবে, তাহার জন্যে শিষ্যমণ্ডলী অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল, মহরম সা, মানিক সা ও কুধু সা প্রভৃতি কয়েকজন ভাল লোক আছেন। ভরসা করি, ইহাদের দ্বারা তাঁহার গৌরব নষ্ট হইবে না. লালন ফকীরের অসংখ্য গান সর্ব্বত্রে সর্ব্বদাই গীত হইয়া থাকে। তাহাতেই তাঁহার নাম, ধর্ম্ম, মত ও বিশ্বাস সুপ্রচারিত হইবে। তাঁহার রচিত একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

গান

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন ভাবে জাতের কি রূপ দেখ্লেম না এই নজরে।

১। কেউ মালায় কেউ তছ্‌বি গলায়,
তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার্ রে।।

২। যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান,
বামণ চিনি পৈতা প্রমাণ,
বামণি চিনি কিসে রে॥

৩। জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথাতথা,
লালন সে জেতের ফাতা
ঘুচিয়াছে সাধ বাজারে॥

রচনা-নির্দশন : নির্বাচিত লালনগীতি

১

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম তাহার পায়।।

আট-কুঠরি নয়-দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝল্‌কা কাটা
তার উপরে সদর-কোঠা
আয়নামহল তায়।।
কপালের ফ্যার নইলে কি আর
পাখিটির এমন ব্যবহার
খাঁচা ভেঙে পাখি আমার
কোন্ বনে পালায়।।
মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশে
কোন্‌দিন খাঁচা পড়বে খসে
ফকির লালন কেঁদে কয়।।

২

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
বাড়ির কাছে আরশিনগর
সেথা এক পড়শি বসত করে।।
গেরাম-বেড়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা, নাই তরণী
পারে।
মনে বাঞ্ছা করি
দেখবো তারি
আমি কেমনে সে গাঁয় যাইরে।।

বলবো কি সেই পড়শির কথা
ও তার হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা
নাইরে।
ওসে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে॥
পড়শি যদি আমায় ছুঁতো
আমার যম-যাতনা যেতো
দূরে।
আবার, সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁকরে॥

৩

এ দেশেতে এই সুখ হলো আবার কোথা যাই না জানি।
পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা জনম গেল ছেঁচতে পানি॥
কার বা আমি কেবা আমার
আসল বস্তু ঠিক নাহি তার
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয়না দিনমণি॥
আর কিরে এই পাপীর ভাগ্যে
দয়ালচাঁদের দয়া হবে
কতদিন এই হালে যাবে
বহিয়ে পাপের তরণী॥
কার দোষ দিব এ ভুবনে
হীন হয়েছি ভজনগুণে
লালন বলে কতদিনে
পাব সাঁইয়ের চরণ দু'খানি॥

৪

কে কথা কয়রে দেখা দেয়না।
নড়েচড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনম-ভর মেলেনা॥

খুঁজি তারে আসমান-জমি
আমারে চিনিনে আমি
এ কি বিষম ভুলে ভ্রমি
আমি কোনজন সে কোন্‌জনা ॥

রাম কি রহিম সে কোন্‌জন
ক্ষিতি জল কি বায়ু-হুতাশন
শুধাইলে তার অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না ॥

হাতের কাছে হয়না খবর
কি দেখতে যাও দিল্লী-লাহোর
সিরাজ সাঁই কয় লালনরে তোর
সদায় মনের ঘোর গেলনা ॥

৫

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখবো চক্ষেতে ॥

আপন ঘরে বোঝাই সোনা
পরে করে লেনা-দেনা
আমি হইলাম জনম-কানা
না পাই দেখিতে ॥

রাজি হলে দারোয়ানি
দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি
তারে বা কই চিনি-শুনি
বেড়াই কুপথে ॥

এই মানুষে আছেরে মন
যারে বলে মানুষ-রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন
পারলাম না চিনিতে ॥

৬

আমার আপন খবর আপনার হয়না।
একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনায়ে চেনা ॥

সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
দেখনা ॥
আমি ঢাকা-দিল্লী হাতড়ে ফিরি
আমার কোলের ঘোর তো যায় না ॥

আত্মরূপে কর্তা হরি
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি
ঠিকানা।
বেদ-২বেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লক্ষণা ॥

আমি আমি কে বলে মন
যে জানে তার চরণ শরণ
লওনা।
ফকির লালন বলে মনের ঘোরে
হলাম চোখ থাকিতে কানা ॥

৭

রসুলকে চিনলে পরে খোদা চেনা যায়।
রূপ ভাঁড়ায়ে দেশ বেড়ায়ে গেলেন সেই দয়াময় ॥

জন্ম যার এই মানবে
ছায়া তার পড়েনা ভূমে
দেখ দেখি ভাই বুদ্ধিমানে
কে আইল মদীনায় ॥

মাঠে-ঘাটে রসুলেরে
মেঘে রয় সে ছায়া ধরে
দেখ দেখি লেহাজ করে
জীবের কি সেই ধৈর্য হয় ॥

আহম্মদ নাম লিখিতে
মিম হরফ হয় নফি করতে
সিরাজ সাঁই কয় লালন তাতে
তোকে কিঞ্চিৎ নজির দেখায় ॥

৮

ঘরে কি আর হয়না ফকিরি।
কেন হলিরে নিমাই আজ দেশান্তরি ॥
ভ্রমিয়ে বারো বসেই তেরো
এমনি হতে পারে কারো
বনে গেলে হয়, সেও তো কথা নয়
মন না হলে নির্বিকারী ॥
মন না মুড়ায়ে কেশ মুড়ালে
তাইতে কি রতন মেলে
মন দিয়ে মন বেঁধেছে যেজন
তারি কাছে সদায় বাঁধা হরি ॥
ফিরে ঘরে চলরে নিমাই
ঘরে সাধলে হবে কামাই
বলে এই কথা কাঁদে শচীমাতা
লালন বলে, লীলের বলিহারি ॥

৯

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে ॥
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীলোকের কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতে প্রমাণ
বাম্‌নী চিনি কিসেরে ॥
কেউ মালা কেউ তসবি গলায়
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়

যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কাররে ॥
গর্তে গেলে কূপজল কয়
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়
মূলে একজল, সে যে ভিন্ন নয়
ভিন্ন জানায় পাত্র-অনুসারে ॥
জগৎ-বেড়ে জেতের কথা
লোকে গৌরব করে যথা-তথা
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাধ-বাজারে ॥

লালনগীতির হিন্দী-রূপান্তর

১

পিঁজ্‌ড়ে কে ভিতর অনুচিনা পানুছি
ক্যায়সে আয়ে যাই
পাকাড় পাতা তো মনু-বেড়ি
লাগাতা উস্‌কে পাঁই ॥
আট কুঠরি ন'দুয়ার হ্যায় আট্‌কা
বিচ্‌ বিচ্‌ মে ঝরোকা কাটা
উস্‌কে উপার্‌ ছদর কোঠা
ফির্‌ আয়নামহাল্‌ তায় ॥
কপাল্‌ কা ফের না হোতা আজ
পানুছি কা হোতা না ইয়ে বেভার্‌
পিঁজ্‌ড়া তোড়্‌ পানুছি মেরা
কিস্‌ জাগা উড়্‌ যাই ॥
মন্‌ তু ঝো রহি পিঁজড়ে কি আশা
পিঁজ্‌ড়া জো তেরা কাঁচে বাঁশ কা
একদিন পিজড়া গিরে গা নীচে
ফকির লালন কাহে রোই ॥

অনুবাদ : মুচকুন্দ দুবে।

২

ঘর্‌কে পাস্‌ এক আর্‌সিনগর
যাঁহা পড়্‌সি বছর্‌ করে
একদিন ভি না দেখ্‌ পায়া উসে রে ॥
গাঁও কে ঘেরে আগাধ্‌ পানি
না-কিনারা না-তরণী পার্‌ রে
উস্‌সে মিলন্‌ কি ইচ্ছা লিয়ে
ক্যায়সে উঁহা যাঁউরে ॥

কিয়া বঁলু পড়্সি কি কাথা
(উস্‌সে) হস্ত-পদ-স্কন্দ-মাথা নেহিরে
সনেক রহে শূন্য-উপার
সনেক ডুবে নীরে ॥

পড়্সি ইয়দি মুঝে ছুঁতা
ইয়স্ ইয়াত্না সব হোতি দূর-রে
উভহ অর্ লালন এক জাগা রাহে
পর লাখো ইয়োজন দূর-রে ॥

অনুবাদ : মুচকুন্দ দুবে।

লালনগীতির ইংরেজী অনুবাদ

১

Who is dwelling in my house?
Him I have not seen even once in life.
He moves in the north and east corner
But I can not find Him with these eyes.
Close by him is the market of the World
He eludes when I want to catch hold of him.

All call Him bird of life,
Which makes me silent.
Is he water ot fire,
Land or air?
None is ever definite to me.
Failed I have to know my house,
Still cherishing to know others.
Lalan asserts "Say God
How is He and how and I?"

Translation : Muhammad Mansooruddin.

২

When shall I meet
    tha man of my choice?
Every moment I long for you
    and want to worship at your feet
    but I am so unfortunate
    that I can't get even a glimpse of you.
As lightning loses its indentity in the cloud,
    so do I want to become one
    with my lord, dark of comlexion.

When I remember the beauty of my lord,
scandal doesn't bother me.
Says Lalon, the person who has known love
will surely share this feeling.

Translation : Abu Rushd.

৩

O my kind-hearted Lord,
Get me across this world.
Pardon my vices
that afflict me
in the cage of a world.
None else but you can pardon me
after your own image.
Put your love in my heart,
I am a sinner;
Unless you expose your merciful
demeanour,
Who will call you benevolent
for the outcast!
On land, water and everywhere
you do exist,
You are felt in all your creations.
It's Lalon's ignorance
That he stands in a trance.

Translation : M. Mizanur Rahman.

৪

How does the Unknown Bird go
into the cage and out again ?
Could I but seize it,
I would put the fetters of my heart
around its feet.

The cage has eight rooms and nine closed doors;
From time to time fire flares out;
Above there is the main room,
the mirror-chamber.

O my heart, you are set on the affairs
of the cage;
(Yet) the cage was made by you,
made with green bamboo;
The cage may fall apart any day.

Lalon says,
The Bird may work its way out
and fly off somewhere.

Translation: Brother James.

৫

I have not seen Him even for a day;
Near my home there is a mirror-city,
and my Neighbour dwells in it.

All around the village is fathomless water;
The water is boundless,
and there is no boat to take me across.
I yearn to see Him,
(but) how shall I get to that hamlet?

What shall I say about this Neighbour of mine?
He has no hands, no feet, no shoulders,
no head.
One moment He is above the void;
The next moment He is afloat in the water.

If my Neighbour would but touch me,
all the pains of death would go away.
He and Lalon are here indeed,
but we remain countless miles apart.

Translation: Brohher James.

৬

O Boatman, take me to the other shore;
Here I am, O Merciful One,
sitting stranded on this side.
I have been left alone at the landing-place;
The sun has gone down already.

Without You I see no escape
from grave, crucial and imminent peril.

Gone are true worship
and effective efforts to reach You.
All my life I have been going astray;
I call on You as rescuer, es saviour;
hence I appeal to You for help and support.

Unless you aid the hapless, the resourceless,
Your good name will be besmirched.
Lalon says,
Who will then call You
Master of the wretched and miserable ?

Translation : Brother James.

তথ্য-নির্দেশ

১. মুহম্মদ এনামুল হক : 'বঙ্গে সুফী-প্রভাব'। কলিকাতা, ১৯৩৫। পৃঃ ১৯৬-৯৭
২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান'। দ্বি-স : কলিকাতা, নববর্ষ ১৩৭৮। পৃঃ ৫৩৪
৩. আবুল আহসান চৌধুরী : 'কুষ্টিয়ার বাউলসাধক'। কুষ্টিয়া, পৌষ ১৩৮০। পৃঃ ৩৫
৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত। প্র-সংস্করণের ভূমিকা : পৃঃ ছ
৫. আনোয়ারুল করীম : 'বাউলসাহিত্য ও বাউলগান'। কুষ্টিয়া, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১। আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভূমিকা : 'কথামুখ'।
৬. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : 'লালন স্মারকগ্রন্থ'। বসন্তকুমার পাল : "ফকির লালন সাহ"। ঢাকা, চৈত্র ১৩৮০। পৃঃ ১২-১৩
৭. বসন্তকুমার পাল : 'মহাত্মা লালন ফকির'। শান্তিপুর-নদীয়া, ১৩৬২। পৃঃ ১৫
৮. ঐ : পৃঃ ১৬
৯. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : 'হারামণি' (২য় খণ্ড)। বাংলা একাডেমী সং : পৌষ ১৩৭৮। পৃঃ ত্রিশ
১০. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৫৪৩-৪৪
১১. 'Journal of the Anthropological Society of Bombay' VOl. V. NO. 4; 1900. P. 217.
১২. হরিনাথ মজুমদার : 'কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ'। দ্বিতীয় ভাগ প্রথম সংখ্যা। কুমারখালী, আখ্যাপত্র ছিন্ন থাকায় প্রকাশকাল জানা সম্ভব হয়নি। তবে তৃতীয় ভাগ ষষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ হওয়ায় ধারণা করা যায় দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ নিশ্চিতভাবেই এর পূর্বে।

১৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৫৪১-৪২

১৪. আনোয়ারুল করীম : 'বাউল কবি লালন শাহ'। দ্বি-স : কুষ্টিয়া, জুলাই ১৯৬৬। পৃঃ ২০

১৫. আনোয়ারুল করীম : 'ফকির লালন শাহ'। কুষ্টিয়া, ফাল্গুন ১৩৮২। পৃঃ ১

১৬. আহমদ শরীফ : 'বিচিত চিন্তা'। "লালন শাহ"। ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮। পৃঃ ৪০৫

১৭. আহমদ শরীফের ২৫.১১.১৯৮৯ তারিখের পত্র : আবুল আহসান চৌধুরীকে লিখিত।

১৮. এ. এইচ. এম. ইমামউদ্দীন : 'বাউল মতবাদ ও ইসলাম'। কুষ্টিয়া, ১৯৬৯। পৃঃ ৬৭

১৯. আনোয়ারুল করীম : 'ফকির লালন শাহ'। পূর্বোক্ত : পৃঃ ১৩

২০. সনৎকুমার মিত্র : 'লালন ফকির : কবি ও কাব্য'। কলিকাতা, ঝুলনযাত্রা ১৩৮৬। পৃঃ ১০৬

২১. বসন্তকুমার পালের ১২.১০.১৯৭০ তারিখের পত্র। 'কুষ্টিয়ার বাউলসাধক' (পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫) গ্রন্থে উদ্ধৃত।

২২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৫৪২

২৩. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : 'হারামণি' (৭ম খণ্ড)। ঢাকা, ভাদ্র ১৩৭১। পৃঃ পরিশিষ্ট : খ-গ

২৪. ঐ : 'হারামণি' (২য় খণ্ড)। পূর্বোক্ত : পৃঃ ত্রিশ

২৫. 'হিতকরী': "মহাত্মা লালন ফকীর"। 'লালন স্মারকগ্রন্থ' (পূর্বোক্ত) : পৃঃ ৮

২৬. বসন্তকুমার পাল : পূর্বোক্ত। পৃঃ ২৬

২৭. 'Journal of the Anthropological Society of Bombay', ibid : P. 217.

২৮. দুর্গাদাস লাহিড়ী : 'বাঙ্গালীর গান'। কলিকাতা, ১৩১২। পৃঃ ৭৬৮

২৯. অনাথকৃষ্ণ দেব : 'বঙ্গের কবিতা'। কলিকাতা, ১৩১৮। পৃঃ ২৮৮

৩০. বসন্তকুমার পাল : পূর্বোক্ত। পৃঃ ২৭

৩১. ঐ : পৃঃ ১৬

৩২. ঐ : পৃঃ ১০৪

৩৩. হেমাঙ্গ বিশ্বাস : 'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম' কলিকাতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫। পৃ: ৬৭-৬৮ (আবুল আহসান চৌধুরীর 'কাঙাল হরিনাথ মজুমদার' : ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮; পৃ: ৫৭, গ্রন্থে উদ্ধৃত)।

৩৪. বসন্তকুমার পাল : পূর্বোক্ত। পৃ: ১১৪

৩৫. দ্র. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত 'লালন স্মারকগ্রন্থে' (পূর্বোক্ত) মুদ্রিত উক্ত দলিলের প্রতিলিপি।

৩৬. এ-সম্পর্কিত দলিল ও কাগজপত্র ছেঁউড়িয়াস্থ 'লালন মাজার শরীফ ও সেবাসদনের সভাপতি ফকির আনোয়ার হোসেন মণ্টু শাহের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৩৭. খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত : 'লালনসাহিত্য ও দর্শন'। ঢাকা, আগষ্ট ১৯৭৬। পৃ: ১৭৮

৩৮. ক্ষিতিমোহন সেন : 'বাংলার বাউল'। কলিকাতা, ১৯৫৪। পৃ: ৫৬

৩৯. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত পৃ: ৫৪৫

৪০. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : 'লালন স্মারকগ্রন্থ'। পূর্বোক্ত : পৃঃ ৩৪

৪১. সুশীল রায় : 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'। কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৭০। পৃ: ২৪৫

৪২. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত :'লালন স্মারকগ্রন্থ'। পূর্বোক্ত : পৃঃ ৩৫

৪৩. শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর ১৪.১২.১৯৪৪ তারিখের পত্র : ছেঁউড়িয়ার 'লালন শাহ আখড়া কমিটি'র সভাপতি কুষ্টিয়ার মহকুমার প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী মহঃ গোলাম রহমানকে (১৯১১-১৯৭৮) লিখিত।

৪৪. সনৎকুমার মিত্র : পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৪

৪৫. ঐ : পৃ: ৬২

৪৬. ঐ : পৃ: 'নিবেদন'-নয়

৪৭. তুষার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'লালন স্মরণিকা'। চাকদহ—নদীয়া ১৯৭৬।

৪৮. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী : 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ'। কলিকাতা, ১১ মাঘ ১৩৮০। পৃ: ১৭০

৪৯. আবুল আহসান চৌধুরী : 'কুষ্টিয়ার বাউলসাধক'। পূর্বোক্ত : পৃ: ১২০-২১

৫০. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : 'হারামণি' (৮ম খণ্ড)। ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩। পৃ: ১০৯

৫১. মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন : 'হারামণি' (৭ম খণ্ড)। পূর্বোক্ত : 'পরিশিষ্ট'—খ
৫২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত। পৃঃ ২৮৯
৫৩. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : 'হারামণি' (১ম খণ্ড)। কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৩৭। পৃঃ ১
৫৪. আহমদ শরীফ : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪০৪
৫৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত। পৃঃ ১৩২
৫৬. আহমদ শরীফ : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪০৪
৫৭. আহমদ শরীফ : 'বাউলতত্ত্ব'। ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৭৯। পৃঃ ৬০
৫৮. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৩০৩-০৪
৫৯. ঐ : পৃঃ ২৯১
৬০. আহমদ শরীফ : 'বাউলতত্ত্ব'। পূর্বোক্ত : পৃঃ ৪৩
৬১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৩৪০
৬২. অন্নদাশঙ্কর রায়: 'লালন ও তাঁর গান'। কলিকাতা, বুদ্ধপূর্ণিমা ১৩৮৫। পৃঃ ১৯
৬৩. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : 'হারামণি' (১ম খণ্ড)। পূর্বোক্ত। 'আশীর্বাদ : পৃঃ ৶.
৬৪. মুহম্মদ আবদুল হাই : 'লালন শাহ ফকির'। ঢাকা, মে ১৯৮০। পৃঃ ১০—১১
৬৫. আবু জাফর : 'বাংলা গানের সুখদুঃখ'। "লালনগীতি"। ঢাকা, আষাঢ় ১৩৯১। পৃঃ ৪৮
৬৬. 'দৈনিক সংবাদ' : ১৮ ও ২৫ পৌষ ১৩৮৩। আশরাফ সিদ্দিকী : "লালনগীতিতে শব্দ-মর্টিফিম"।
৬৭. আবু জাফর : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪৮
৬৮. ঐ : পৃঃ ৪৫
৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ছন্দ'। পরিবর্ধিত সং : কলিকাতা, বিশ্বভারতী, নভেম্বর ১৯৬২। পৃঃ ১৩০
৭০. ঐ : পৃঃ ১৩০
৭১. ঐ : পৃঃ ১৩২
৭২. এস.এম. লুৎফর রহমান লালনগীতির ছন্দ-অলঙ্কার বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর 'লালন-জিজ্ঞাসা' (ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪) গ্রন্থে।
৭৩. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : 'লালন স্মারকগ্রন্থ'। কাজী মোতাহার হোসেন : "সাধক লালন শাহ"। পূর্বোক্ত : পৃঃ ৬১

৭৪. অন্নদাশঙ্কর রায় : পূর্বোক্ত। পৃঃ ১৭—১৮
৭৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত। পৃঃ ১০৫
৭৬. আহমদ শরীফ : 'বিচিত চিন্তা'। পূর্বোক্ত : পৃঃ ৪০৫
৭৭. অন্নদাশঙ্কর রায় : পূর্বোক্ত। পৃঃ ২৪—২৫
৭৮. অমলেন্দু দে : 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ'। কলিকাতা, ৯ মে, ১৯৭৪। পৃঃ ৪-৫
৭৯. অরবিন্দ পোদ্দার : 'মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ'। দ্বি-স : কলিকাতা, অক্টোবর ১৯৫৮। পৃঃ ২৫৮
৮০. বসন্তকুমার পাল : 'তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব'। কুচবিহার, আষাঢ় ১৩৭৯। পৃঃ ৮০
৮১. এই গান এবং 'এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে' গানটি এস. এম. লুৎফর রহমানের সংগ্রহ থেকে গৃহীত ('লালন-গীতি চয়ন' : ১ম খণ্ড। ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৫)।
৮২. হেমাঙ্গ বিশ্বাস : 'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম'। পূর্বোক্ত : পৃঃ ৬৭—৬৮
৮৩. 'কাঙ্গাল হরিনাথের ৭৪ তম বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব স্যারকপত্র'। কলিকাতা, ৬ বৈশাখ ১৩৭৬। বিশ্বনাথ মজুমদার : "কাঙ্গাল হরিনাথ"। পৃঃ ১
৮৪. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : 'হারামণি' (১ম খণ্ড)। পূর্বোক্ত : 'আশীর্ব্বাদ', পৃঃ ।/০
৮৫. জলধর সেন : 'কাঙ্গাল হরিনাথ' (১ম খণ্ড)। কলিকাতা, ১৫ আশ্বিন ১৩২০। পৃঃ ২৩
৮৬. আবুল আহসান চৌধুরী : 'কুষ্টিয়ার বাউলসাধক'। পূর্বোক্ত : পৃঃ ৪৭
৮৭. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী : পূর্বোক্ত। পৃঃ ১২৩
৮৮. বসন্তকুমার পাল : 'মহাত্মা লালন ফকির'। পূর্বোক্ত : প : ।৶৹
৮৯. রাসবিহারী জোয়ারদার সঙ্কলিত : 'গোপাল গীতাবলী'। দ্বি-স : কুষ্টিয়া. বৈশাখ ১৩৬৪। পৃঃ ।/০
৯০. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : 'হারামণি' (৪র্থ খণ্ড)। ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৫৯। পৃঃ ৬৪-৬৫
৯১. ঐ : 'হারামণি' (৮ম খণ্ড)। পূর্বোক্ত : পৃঃ (৮৬)
৯২. ঐ : পৃঃ (৮৬)

৯৩. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৩য় খণ্ড)। তৃ-স : কলিকাতা, ১৩৬৮। পৃঃ ১৫৩
৯৪. পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত : 'রবীন্দ্রায়ণ' (২য় খণ্ড)। বিনয় ঘোষ : "রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি"। কলিকাতা, ২২ শ্রাবণ ১৩৬৮। পৃঃ ৬৯
৯৫. আনোয়ারুল করীম : 'বাউল কবি লালন শাহ'। পূর্বোক্ত : পৃঃ ১৮৮
৯৬. 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা' : শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৮১। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : "লালন ফকির"।
৯৭. অন্নদাশঙ্কর রায় : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৫১
৯৮. আসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলাসাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'। তৃ-স : কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮। পৃঃ ৩৩৭
৯৯. সৈয়দ মুর্তাজা আলী : 'প্রবন্ধ-বিচিত্রা'। ঢাকা, আষাঢ় ১৩৭৪। পৃঃ ২২২
১০০. সনৎকুমার মিত্র : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৩—১৩
১০১. 'পরিচয়' : চৈত্র ১৩৬৪। চিত্তরঞ্জন দেব : "রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ : লালন ফকিরের গান"। পৃঃ ৮৮৭-৮৮
১০২. রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী : 'কয়েকজন লোককবি এবং প্রসঙ্গত'। ঢাকা, আষাঢ় ১৩৯১। পৃঃ ২২-২৪
১০৩. আবুল আহসান চৌধুরী : 'কুষ্টিয়ার বাউল সাধক'। পূর্বোক্ত : পৃঃ ১২০
১০৪. শান্তিদেব ঘোষ : 'রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা'। কলিকাতা, জুলাই ১৯৭২। পৃঃ ১১৬
১০৫. রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিবের ২০.৭.১৯৩৯ তারিখের পত্র : বসন্তকুমার পালকে লিখিত। এই পত্রটি বা এর বিষয়বস্তু ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়নি।
১০৬. Rabindranath Tagore : 'Creative Unity'. Indian Edition, 1971. PP. 69--90
১০৭. রবীন্দ্রনাথের লালনচর্চার বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরীর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (পৃঃ ২১-৩১) এবং চিত্তরঞ্জন দেবের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।
১০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'জীবনস্মৃতি'। চ-স : কলিকাতা, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ-মাঘ ১৩৬৮। পৃঃ ১১৫

১০৯. ঐ : 'ছন্দ'। পূর্বোক্ত : পৃঃ ১২৯-৩৭

১১০. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ'। কলিকাতা, ওরিয়েণ্ট সংস্করণ ১৯৫৮। পৃঃ ১০০

১১১. আবুল আহসান চৌধুরী : 'কুষ্টিয়ার বাউলসাধক'। পূর্বোক্ত : পৃঃ ৪৯

১১২. সনৎকুমার মিত্র : পূর্বোক্ত। পৃঃ ২৬৬

১১৩. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : 'লালন স্মারকগ্রন্থ'। পূর্বোক্ত : পৃঃ ৩৭

১১৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৫৩৩

১১৫. অন্নদাশঙ্কর রায় : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪২

১১৬. বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডক্টর পশুপতি শাশমল প্রেরিত 'রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালন-পাণ্ডুলিপির বিবরণ' (নির্দেশক সংখ্যা—র / ৯০৪ ; তাং ৯.২.১৯৭৪)।

১১৭. রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী : পূর্বোক্ত। পৃঃ ২৬

১১৮. সনৎকুমার মিত্র : পূর্বোক্ত। পৃঃ ১০৮

১১৯. রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী : পূর্বোক্ত। পৃঃ ২৭

১২০. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : 'হারামণি' (১ম খণ্ড)। পূর্বোক্ত : পৃ. /০

১২১. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : পূর্বোক্ত। পৃঃ ১০০

১২২. সুকুমার সেন : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪৮৮

১২৩. মতিলাল দাশ ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত : 'লালন-গীতিকা'। কলিকাতা, ১৯৫৮। পৃঃ 'ভূমিকা'-।০

১২৪. সৈয়দ আকরম হোসেন : 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও ও শিল্পরূপ'। ঢাকা, ২৫ বৈশাখ ১৩৮৮। পৃঃ ১৫

১২৫. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : 'লালন স্মারকগ্রন্থ'। মতিলাল দাশ : "লালন ফকিরের গান"। পূর্বোক্ত : পৃঃ ৩৭

১২৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সাহিত্য'। কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৮০। পৃ. ২২৭-২৮

১২৭. 'দৈনিক সংবাদ' : ২ চৈত্র ১৩৯৫। আবুল আহসান চৌধুরী : "লালন-চর্চার প্রথম নিদর্শন"।

১২৮. মীর মশাররফ হোসেন (আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত): 'সঙ্গীত লহরী'। কুষ্টিয়া ৭ ফাল্গুন ১৩৮২। ৮৯ সংখ্যক গান : পৃঃ ৫৬

১২৯. 'লোকসাহিত্য পত্রিকা': কুষ্টিয়া, জানুয়ারী ১৯৭৫। আবুল আহসান চৌধুরী : "লালনজীবনীর উপাদান : 'হিতকরী' পত্রিকা"। পৃঃ ১৩১-৩৪

১৩০. রাইচরণ দাস : 'মনের কথা অনেক কথা'। কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৮৪। পৃ. ২৯। রাইচরণ দাসের দৌহিত্র বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাময়িকপত্রসেবী কুমারেশ ঘোষও (জ. ১৯১৩) 'হিতকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত লালন-সম্পর্কিত নিবন্ধের রচয়িতা যে রাইচরণ সে-তথ্য অনুমোদন করেছেন।

১৩১. বসন্তকুমার পাল : 'মহাত্মা লালন ফকির'। পূর্বোক্ত : পৃঃ ২

১৩২. 'The Journal of the Anthropological Society of Bombay': Ibid, P. 217

১৩৩. কুমুদনাথ মল্লিক (মোহিত রায় সম্পাদিত) : 'নদীয়া-কাহিনী'। তৃ-স : কলিকাতা, ১৪ ভাদ্র ১৩৯৩। পৃঃ ২৮৫-৮৬

১৩৪. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : 'হারামণি' (২য় খণ্ড)। পূর্বোক্ত : পৃঃ একত্রিশ-বত্রিশ

১৩৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৫৪১

১৩৬. বসন্তকুমার পাল : 'মহাত্মা লালন ফকির'। পূর্বোক্ত : পৃঃ ১-২

১৩৭. ঐ : 'তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব'। পূর্বোক্ত : 'আশীর্বচন'।

১৩৮. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৫৩৬

১৩৯. আবুল আহসান চৌধুরী : 'কুষ্টিয়ার বাউলসাধক'। পূর্বোক্ত : 'আশীর্বাণী'। পৃঃ পনর

১৪০. অধ্যাপক আবু জাফরের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য।

১৪১. মকছেদ আলী শাহ ও গোলাম ইয়াছিন শাহ সম্পাদিত : 'সেদিনের এই দিনে' ('And this day')। কুষ্টিয়া ১৯ মার্চ ১৯৮১। তৃতীয় প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বক্তব্য।

১৪২. তুষার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত : পূর্বোক্ত। দীপক দাশগুপ্ত : "বিগত জন্মবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে লালনচর্চা"। পৃঃ ১৪৩-৪৬

১৪৩. পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট গবেষক অশোক উপাধ্যায়ের (দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়) সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য।

১৪৪. 'মাসিক বাঙলাদেশ' : মাঘ ১৩৮১। রণজিৎকুমার সেন : "লালন ফকির : দ্বিশতবার্ষিকী সমীক্ষা"। পৃঃ ৬৬১। (রণজিৎকুমার সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

১৪৫. নদীয়ার কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক মোহিত রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য।

১৪৬. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক এস.এম. আবদুল লতিফের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৪৭. তুষার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত : পূর্বোক্ত। আবুল আহসান চৌধুরী : "লালন দ্বিশত জন্মবর্ষে বাঙলাদেশে লালনচর্চা"। পৃঃ ১৩৪-৩৮

১৪৮. ঐ। দীপক দাশগুপ্ত : পূর্বোক্ত। পৃঃ ১৪০-৪৩

১৪৯. ইংরেজি-ভাষায় বাউল ও লালনচর্চার তথ্য লালন একাডেমীর পরিচালক ডঃ আনোয়ারুল করীমের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৫০. অধ্যাপক আবু জাফরের সৌজন্যে মুচকুন্দ দুবে-অনূদিত দু'টি লালনগীতি এই গ্রন্থের 'রচনা-নিদর্শন : নির্বাচিত লালনগীতি' অধ্যায়ে মুদ্রিত হলো।

১৫১. 'দৈনিক বাংলা': ৯ মাঘ ১৩৮১ (২৩ জানুয়ারী ১৯৭৫)।

১৫২. লালনচর্চার এই বিবরণ সংগ্রহ ও তালিকা-প্রণয়ণে আবুল আহসান চৌধুরীর 'কুষ্টিয়ার বাউলসাধক' (১৯৭৪), মনিরুজ্জামানের 'বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতি সন্ধান' (ঢাকা ১৩৮৯), শামসুজ্জামান খান ও ও মোমেন চৌধুরী সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ফোকলোর রচনাপঞ্জি' (ঢাকা, ১৩৯৪) গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। এ-বিষয়ে তথ্য-সংগ্রহে সবচেয়ে কার্যকর সহযোগিতা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট গবেষক অশোক উপাধ্যায় (দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)। শ্রী উপাধ্যায়ের নিকটে আমি বিশেষভাবে ঋণী। বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য আমি প্রফেসর আহমদ শরীফ, প্রফেসর সনজীদা খাতুন, ডক্টর সনৎকুমার মিত্র, মোহিত রায়, অমলেন্দুশেখর পাল, আলমগীর রেজা চৌধুরী, রণজিৎকুমার সেন, অধ্যাপক এস.এন. আবদুল লতীফ ও গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে কৃতজ্ঞ। আলোকচিত্রের জন্য কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা'র সম্পাদক আবদুর রশীদ চৌধুরীর আন্তরিক সহযোগিতার কথা স্মরণ করি।

১৫৩. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : 'লালন স্মারকগ্রন্থ'। পূর্বোক্ত : পৃ: ১০৫-২৬

১৫৪. 'The Journal of the Antropological Society of Bombay'. Ibid : P. 218

১৫৫. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : 'লালন স্মারকগ্রন্থ'। পূর্বোক্ত : পৃ: ১১৬-১৭

১৫৬. ঐ। পৃ: ১১৭

১৫৭. মৌলবী রেয়াজউদ্দীন আহমদ : 'বাউলধ্বংস ফৎওয়া' (২য় খণ্ড) রংপুর, ১৩৩৩। পৃ: ২৫-২৬

১৫৮. মোহাম্মদ আকরম খাঁ : 'মোছলেমবঙ্গের সামাজিক ইতিহাস'। ঢাকা, অগ্রাহয়ণ ১৩৭২। পৃ: ১১৭

১৫৯. আবু ইমরান হোছাইন : 'জওয়াবে ইবলিস'। কুষ্টিয়া, ১৯৬৮। পৃ: ৩৩-৩৪

১৬০. মো: আবু তাহের বর্দ্ধমানী : 'সাধু সাবধান'। দিনাজপুর, রমজান ১৩৯৯ হিজরী। পৃ: ৩১-৩২

১৬১. 'আল-জাদীদ-২'। কুষ্টিয়া, ২২ মে ১৯৮৬। ম. আ. সোবহান : "বাউল একটি ফেতনা"। পৃ: ৬

১৬২. 'সাপ্তাহিক ইস্পাত': কুষ্টিয়া, ১৬ নভেম্বর ১৯৮৯। ম. আ. সোবহান : "নারীভজনকারী বাউল লালন শাহ"।

১৬৩. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : 'লালন স্মারকগ্রন্থ'। পূর্বোক্ত : পৃ: ১২৩-২৪

১৬৪. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : 'হারামণি' (২য় খণ্ড)। পূর্বোক্ত : পৃ: ২০৪

১৬৫. 'সাপ্তাহিক যোগাযোগ' : কুষ্টিয়া, ১২ মার্চ ১৯৬৫। ইবনে তালিব ওবায়দুল্লাহ : "বাউলের ইতিকথা"। পৃ: ৪

১৬৬. কাজী আবদুল ওদুদ : 'শাশ্বত বঙ্গ'। কলিকাতা, ১৩৫৮। পৃ: ৩৩৬

১৬৭. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৪৫